Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সায়মা আক্তার

রোলঃ 228021184

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সায়মা আক্তার

রোলঃ 228021184

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সায়মা আক্তার, আইডিঃ 228021184 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সায়মা আক্তার

আইডিঃ 228021184

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

❀ভূমিকা :

আধুনিক যুগের ব্যস্ত সমাজে মানুষের মুখই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র—এই অস্ত্র দিয়ে যেমন মানুষকে উৎসাহিত করা যায়, তেমনি ধ্বংসও করা যায়। এই মুখ থেকে উচ্চারিত কিছু কথাই হয়ে ওঠে পাপের এমন এক ভয়ানক মাধ্যম, যার প্রভাব শুধু ব্যক্তির উপর নয়, বরং গোটা সমাজের ওপর পড়ে। এই ভয়ংকর পাপের নাম গীবত।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যেখানে মানুষের প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি শব্দ ও সংলাপের হিসাব রাখা হয়েছে। মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে ইসলাম যে কতটা সংবেদনশীল, তার অন্যতম প্রমাণ গীবতের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। গীবত এমন একটি পাপ, যা মানুষকে ধীরে ধীরে আত্মিকভাবে নিঃশেষ করে দেয়, সমাজে অনাস্থা, বিদ্বেষ এবং বিভেদ সৃষ্টি করে।

আসলে গীবত শুধু একটি মৌখিক অভ্যাস নয়—এটি একটি নৈতিক ব্যাধি, যা অন্তর থেকে জন্ম নিয়ে মুখ দিয়ে বের হয় এবং সমাজে বিষ ছড়ায়। আজকের ডিজিটাল যুগে এই গীবত আরও বেশি বিস্তার লাভ করছে, কখনও বন্ধু আড্ডায়, কখনও আত্মীয় মহলে, আবার কখনওবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে—যেখানে মানুষ সহজেই অপরের মানহানি করে বসছে।
প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত,সম্পদ ও সম্মান অপর মুসলমানের উপর হারাম। অর্থাৎ সম্মানিত। তাই এগুলোর সম্মান রক্ষা করতে হবে।

কাজেই গীবত কি? গীবতের ক্ষতি,কিভাবে গীবত থেকে বাঁচতে পারি? গীবত সংক্রান্ত এসব বিষয় নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

❀গীবতের সংজ্ঞা:

গীবত (غِيبَة) আরবি শব্দ "غَيَبَ" (ghayba) থেকে এসেছে, যার অর্থ "গোপন থাকা" বা "অবস্থিতি থেকে অনুপস্থিত থাকা"। গীবত হলো এমন একটি অপকর্ম যেখানে একজন ব্যক্তি অন্য কারো অনুপস্থিতিতে, তার সম্পর্কে এমন কিছু বলে যা ঐ ব্যক্তি পছন্দ করবে না বা যার ফলে তার সম্মান ও মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইসলামী পরিভাষায়, গীবত এমন একটি পাপ, যা একজন ব্যক্তির পিছনে, তার অজান্তে, তার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলা বা

সমালোচনা করা হয়। এর মাধ্যমে সেই ব্যক্তির গোপন দোষ বা দুর্বলতা প্রকাশিত হয়, যা সে কখনোই প্রকাশ করতে চায় না এবং এতে তার সম্মানহানি ঘটে।

এটি শুধু একটি মৌখিক অপরাধ নয়, বরং একজন ব্যক্তির চরিত্র, সামাজিক অবস্থান, বা গোপন দোষ সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হতে পারে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) গীবতের প্রকৃত সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন এক হাদীসে:

"তোমরা একে অপরের গীবত কোরো না। গীবত হলো এমন কিছু বলা যা তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে সে পছন্দ করবে না।" (সাহীহ মুসলিম)

গীবতের মাধ্যমে শুধু ঐ ব্যক্তির আত্মসম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং এটি সমাজের শান্তি, একতা এবং সৌহার্দ্যকে নষ্ট করে। ইসলামে গীবতকে অত্যন্ত মারাত্মক একটি পাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ এর ফলে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের জন্য ক্ষতির সৃষ্টি হয়। কুরআন এবং হাদীসের আলোকে, এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, গীবত এক ধরনের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক অপরাধ, যা মুসলিম সমাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ।

❁ গীবত ও অপবাদ: পার্থক্য এবং সংশ্লিষ্টতা

গীবত এবং অপবাদ দুটি অত্যন্ত গুরুতর পাপ, যা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং দুটির মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক রয়েছে। উভয়ই একে অপরের সম্মান ক্ষুণ্ন করে, কিন্তু এর মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য এবং একে অপরের সাথে কিছু সংশ্লিষ্টতাও আছে। এখানে, আমরা গীবত এবং অপবাদের পার্থক্য ও সংশ্লিষ্টতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

গীবত (Backbiting):

গীবত হলো এমন একটি পাপ, যেখানে কোনো ব্যক্তি অন্য একজনের উপস্থিতি ছাড়া তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলে। এটি সাধারণত তার দোষ, খুঁত বা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলা হয়, যা ঐ ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে করা হয়। গীবত সাধারণত অন্যের সম্মানকে হানি করে এবং তাদের সম্পর্কে মন্দ মন্তব্য করা হয়।

গীবতের উদাহরণ:

কাউকে সরাসরি না বলেই, তার বাচনভঙ্গি, চরিত্র বা কাজ নিয়ে অন্যদের কাছে খারাপ মন্তব্য করা।

কাউকে নিয়ে তার দুর্বলতা বা অপূর্ণতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা।

এমন কিছু বলা যা ঐ ব্যক্তির সামনে বলা যাবে না এবং তার সম্মান নষ্ট করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না।" (মুসলিম)

অপবাদ (Slander):

অপবাদ হলো অন্য কোনো ব্যক্তির উপর মিথ্যা অভিযোগ বা অপবাদ আরোপ করা। এটি এমন একটি পাপ যেখানে এক ব্যক্তি অন্যের প্রতি মিথ্যা দোষ বা অজ্ঞাত কারণে অপবাদ দেয়, যার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির সম্মান নষ্ট হয় এবং তার সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। অপবাদে মিথ্যা বলা বা বেআইনি কিছু অভিযোগ আনা হয়, যা মূলত ভ্রান্ত ও অবাস্তব।

অপবাদের উদাহরণ:

অন্যকে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করা।
কাউকে মিথ্যা ভাবে খারাপ আচরণের জন্য অভিযুক্ত করা, যেমন: চুরি, ধর্মভ্রষ্টতা, অন্যায় কাজ করা ইত্যাদি।
কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা এবং সমাজে তাকে কলঙ্কিত করা।
ইসলামে অপবাদ দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ এবং এটি একটি গুরুতর অপরাধ। আল্লাহ তাআলা বলেন:
"যারা মিথ্যা অপবাদ দেয় তারা জানে না যে তারা কী অপরাধ করছে।" (সূরা আল-নূর, ২৪: ১৫)

গীবত এবং অপবাদের পার্থক্য:

1. বিষয়ের সত্তা:
গীবত হলো একটি ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া তার চরিত্র, আচরণ বা দুর্বলতার কথা বলা, যেটা সত্য এবং সেসব সেই ব্যাক্তির ভেতর বিদ্যমান। আর অপবাদ হলো মিথ্যা অভিযোগ যা সে করেনি বা যে চরিত্রের অধিকারী সে নয় বা অপপ্রচার যা কাউকে হেয় করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়।

2. মিথ্যাচার:
গীবত সাধারণত সত্যিকার তথ্যের ভিত্তিতে হতে পারে, অর্থাৎ যা সত্যি, তবে অন্যের সম্মান ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়। অপরদিকে, অপবাদ হল সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ যা ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করার জন্য ছড়ানো হয়।

3. উদ্দেশ্য:

গীবত সাধারণত অন্যের সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করার মাধ্যমে তাদের সম্মান হানি করার উদ্দেশ্যে করা হয়, যেখানে অপবাদ একটি শত্রুতামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে মিথ্যা অভিযোগ তৈরি করে, যার ফলে সেই ব্যক্তির সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

4. মামলার ব্যাপ্তি:

গীবত সাধারণত কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত আচরণ বা দুর্বলতা নিয়ে হয়, যেখানে অপবাদে কিছু বড় বা গুরুতর অভিযোগ আনা হয়, যেমন চুরি, ধর্ষণ, অন্যায় ইত্যাদি।

5. দোষের মানসিকতা:

গীবত সাধারণত এমন ব্যক্তিদের প্রতি হয় যারা নিজের অজান্তে এমন কিছু আচরণ করছেন যা সমাজে তাদের সম্মান কমিয়ে দেয়, তবে অপবাদ সাধারণত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয় যাতে একেবারে মিথ্যা অভিযোগকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

গীবত এবং অপবাদের সংশ্লিষ্টতা:

1. সম্মান ক্ষুণ্ন করা:

উভয় ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ বিষয় রয়েছে, তা হল, অন্য মানুষের সম্মান ও সুনাম নষ্ট করা। গীবত বা অপবাদ, দুটি ক্ষেত্রেই সেই ব্যক্তির সম্মান নষ্ট করা হয়। তবে গীবত সাধারণত সত্যের ভিত্তিতে ঘটে, অথচ অপবাদ পুরোপুরি মিথ্যা।

2. ভ্রষ্টতার পথে পরিচালনা:

গীবত এবং অপবাদ দুটোই ইসলামে হারাম। এটা যেকোনো সমাজের জন্যই হানিকর এবং এর মাধ্যমে সমাজে বিভ্রান্তি, শত্রুতা এবং অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদ দেয় সে আমার উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।" (মুসলিম)

3. প্রকৃত পরিণতি:

উভয় ক্ষেত্রেই পরিণতি ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা এবং রাসূল (সা.) গীবত এবং অপবাদের শাস্তি সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিসে উল্লেখ করেছেন। এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে পাপের শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে।

গীবত এবং অপবাদ ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিষিদ্ধ এবং মারাত্মক পাপ। এগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তবে উভয়ই মানুষের সম্মান হানি এবং সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। গীবত সত্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়, তবে অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। উভয়েরই পরিণতি দুঃখজনক এবং পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হতে হতে পারে। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়, যেন আমরা কখনো অন্যদের সম্মান নষ্ট না করি এবং সর্বদা সৎ, সত্যবাদী এবং ন্যায়পরায়ণ থাকি।

❁গীবতের পরিচয় সংক্রান্ত হাদীস

ইসলামে এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো বাহ্যিকভাবে ছোট মনে হলেও আখিরাতে তার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। তন্মধ্যে একটি ভয়াবহ পাপ হলো **গীবত**। এটি এমন এক মন্দ কাজ, যা সমাজে পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, দন্দ্ব ও বিভক্তির সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীসে গীবতের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিণতি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

১. গীবতের মৌলিক সংজ্ঞা হাদীসে

হযরত আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, **"গীবত কী?"** তিনি বললেন:

"ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ**"**

অর্থ: "তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে।"

অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, **"যদি তা সত্যিই তার মধ্যে থাকে?"** তিনি বললেন:

"إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ**"**

অর্থ: "যদি তা তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি তার গীবত করেছ; আর যদি তা না থাকে, তবে তুমি তার ওপর অপবাদ দিয়েছ।"

— (সহীহ মুসলিম: হাদীস ২৫৮৯)

এই হাদীসটি গীবতের সংজ্ঞা এত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে, কোনো প্রকার দ্বিধা বা সংশয় থাকে না। ইসলামে এমনকি সত্য বলেও যদি কারো সম্মান ক্ষুণ্ন হয়, তবুও তা গীবতের মধ্যে পড়ে।

২. গীবতকারীর প্রতি আল্লাহর সতর্কতা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:

"يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، لاَ تَغْتَابُوا المُسْلِمِينَ، وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِم"...

— (সুনান আবু দাউদ: ৪৮৮০)

অর্থ: "হে তারা, যারা মুখে ঈমান এনেছে কিন্তু ঈমান এখনো তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না, আর তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধান করো না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার গোপন দোষ খুঁজে বের করবেন। আর আল্লাহ যখন কারো গোপনতা খোঁজেন, তখন তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপমানিত করেন।"

এই হাদীসটি গীবতের সামাজিক ও আখিরাতের পরিণতি সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। গীবতের মাধ্যমে শুধু অন্যকে অপমান করা হয় না, বরং সেই ব্যক্তি নিজেও আল্লাহর শাস্তির আওতায় পড়ে যায়।

৩. গীবতের ভয়ানক দৃশ্য মিরাজে প্রদর্শিত হয়েছিল

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:

"رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي قَوْمًا لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِم"

— (সুনান আবু দাউদ: হাদীস ৪৮৭৮)

অর্থ: "আমি মেরাজের রাতে একদল লোক দেখলাম, যাদের নখ ছিল তামার তৈরি, আর তারা সেগুলো দিয়ে নিজেদের মুখ ও বুক আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম: হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন: এরা সেইসব মানুষ, যারা লোকদের গোশত খায় (গীবত করে) এবং তাদের সম্মানে আঘাত করে।"

এই হাদীসটি গীবতের শারীরিক ও আখিরাতের শাস্তির দিকটি স্পষ্ট করে। এখানে 'মানুষের গোশত খাওয়া' বলতে বোঝানো হয়েছে—পেছনে সমালোচনা করা, যা ইসলামে সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধগুলোর একটি।

৪. গীবতের সাথে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার তুলনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে বলেন:

"وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوه"

— (সূরা হুজরাত, ৪৯:১২)

অর্থ: “তোমরা কেউ অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে? নিশ্চয়ই তা তোমরা ঘৃণা করো।”
যদিও এটি কুরআনের আয়াত, তবুও রাসূল (সাঃ) বহু হাদীসে এই আয়াতের অর্থের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো জঘন্য কাজ গীবতের সঙ্গে তুলনা করে ইসলাম গীবতের ভয়াবহতা কত গভীর তা ব্যাখ্যা করেছে।

৫. মুখে ঈমান, কাজে গীবত—এটি মুনাফিকদের চরিত্র
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:

"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"
— (সহীহ বুখারী: ১০)

অর্থ: “সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।”
এই হাদীস অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি তার জিহ্বা দ্বারা অন্য মুসলমানকে আঘাত করে, গীবত করে, তবে সে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার যোগ্যতা হারায়। এটি সরাসরি ঈমানের মানদণ্ডকে স্পর্শ করে।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট হয় যে, গীবত ইসলামের দৃষ্টিতে এক চরম পাপ। এটি কেবল সামাজিকভাবে মানুষকে অপমানিত করে না, বরং আখিরাতে চরম শাস্তির কারণ হয়। প্রতিটি মুসলমানের উচিত, গীবতের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে নিজেদের জিহ্বা সংযত রাখা, পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে বেঁচে থাকা। একজন প্রকৃত মুমিন কখনো অন্য ভাইয়ের সম্মানহানির পথে পা বাড়াতে পারে না।

✿বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে গীবতের শরীয়তসম্মত অর্থ

গীবত শুধু ব্যাক্তি নয়,বরং সমগ্র সমাজকে নৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে।শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উম্মাহর আলেমগন গীবতের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও শরীয়ত সম্মত বিশ্লেষণ নিয়ে গবেষনা করেছেন।

১. শব্দমূল বিশ্লেষণে গীবত
ইমাম রাগিব ইস্পাহানি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত অভিধান “আল-মুফরাদাত” এ বলেন:
"الغَيْبَةُ: ذِكْرُ الإنسان في غَيْبَتِهِ بما يَكْرَه"ُ
অর্থাৎ, গীবত হলো কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন কোনো বিষয় উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে গীবতের মূলকথা হলো—কারো অনুপস্থিতিতে এমন কিছু বলা, যা যদি সে উপস্থিত অবস্থায় শুনত, তাহলে কষ্ট পেত বা অপমানিত বোধ করত।

২. ইমাম নববী (রহ.)-এর সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম আন-নববী (রহ.) তাঁর গ্রন্থ "আল-আযকার" ও "রিয়াদুস সালিহিন" এ লিখেছেন:

"اعلم أن الغيبة ذكرك الإنسان بما فيه مما يكرهه لو بلغه، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه"

অর্থাৎ, গীবত হলো—তোমার মুসলিম ভাইয়ের এমন কিছু বলা, যা তার দেহ, ধর্ম বা পার্থিব জীবন সম্পর্কিত—এবং যা সে জানতে পারলে অপছন্দ করত।

ইমাম নববী (রহ.) স্পষ্ট করে বলেন, গীবত শুধু দোষ নয়, বরং এমন কিছু উল্লেখ করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত যা তার চেহারা, কাপড়, স্বভাব, কথাবার্তা, সন্তান, পরিবার, আচরণ অথবা পেশার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—যা তাকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে।

৩. ইমাম গাযযালী (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি

ইমাম আবু হামিদ আল-গাযযালী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *"ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন"*-এ গীবতের বহুপ্রস্থ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন—

"গীবত হলো এমন একটি মন্দ স্বভাব, যা মুখে উচ্চারিত হয়, কিন্তু হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয়। এটি মানুষকে অন্যের দোষ দেখার দিকে প্রবণ করে তোলে, অথচ নিজের দোষ সে ভুলে যায়।"

তিনি আরও বলেন—গীবতের ভেতরে থাকে অহংকার, হিংসা, হাস্যরস, দোষারোপ, অবমূল্যায়নের মতো নানা চরিত্রগত ব্যাধি, যা মানুষের আত্মাকে নষ্ট করে দেয়।

৪. আল্লামা শাওকানী (রহ.)-এর বর্ণনা

তাফসিরকারক ও বিশিষ্ট মুজতাহিদ আল্লামা শাওকানী (রহ.) গীবতের বিষয়ে বলেন—

"গীবত হলো এমন পাপ, যার দ্বারা মানুষ অন্যের সম্মান চুরি করে, কিন্তু তা প্রকাশ পায় না; অথচ আখিরাতে এর বিচার আল্লাহর কাছে সবচেয়ে কঠিন।"

তিনি আরও বলেন, গীবতের প্রকৃতি চোরের চেয়েও ভয়াবহ, কারণ একজন চোর সম্পদ চুরি করে, কিন্তু গীবতকারী চুরি করে অন্যের সম্মান—যা সম্পদের চেয়েও বড়।

৫. সমসাময়িক আলেমদের দৃষ্টিতে গীবত

বর্তমান যুগের বহু শরীয়ত বিশেষজ্ঞ, যেমন শায়খ সালিহ আল-ফাওজান, ড. ইউসুফ আল-কারযাভি, ও শায়খ আবদুল আজিজ আত-তারিফি প্রমুখ আলেমগণ গীবতের শারঈ ব্যাখ্যায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তারা বলেন:

"যেকোনো কথাবার্তা, পোস্ট, মেসেজ, ভিডিও বা সামাজিক মাধ্যমে এমন কিছু প্রকাশ করা, যা কারো সুনাম ক্ষুণ্ন করে—তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি মুখে না বলে ইঙ্গিত করলেও তা গীবতের আওতায় পড়ে।"

ড. ইউসুফ আল-কারযাভি বলেন—**"গীবত শুধু মুখের শব্দ নয়, বরং মনোভাবের প্রকাশও হতে পারে। কারো প্রতি খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দেওয়া বা মানুষকে সেই দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আকৃষ্ট করাও গীবত।"**

সুতরাং আলেমদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, গীবত এমন এক নৈতিক ব্যাধি, যা কেবল জিহ্বার ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নয় বরং হৃদয়ের রোগ, দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃতি এবং আচার-আচরণের বিপর্যয়ের বহিঃপ্রকাশ। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি হারাম এবং মারাত্মক গুনাহ। ইসলামী জ্ঞানের খ্যাতিমান রত্নেরা গীবতের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যায় অত্যন্ত গভীর এবং বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন, যা গীবত থেকে বেঁচে থাকতে আমাদের চিন্তা-ভাবনায় শুদ্ধি আনে।

✿ গীবত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইসলাম এমনই এক ধর্ম যা মানুষের প্রতিটি কথাবার্তা ও আচরণের জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। গীবতের মতো আত্মঘাতী পাপের বিরুদ্ধে কুরআনে কারীমে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আয়াত এবং তাদের শর্ট আরবি রেফারেন্সসহ অর্থ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো:

১. সূরা হুজুরাত: আয়াত ১২

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُم بَعْضًا

"তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে।" (সূরা হুজুরাত ৪৯:১২)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা গীবতের ভয়াবহতা এমনভাবে তুলে ধরেছেন, যেন কেউ নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাচ্ছে। এটা শুধু নিষেধ নয়, বরং অন্তরের ঘৃণাকে জাগ্রত করার এক দারুণ উপমা।

২. সূরা ক্বালাম: আয়াত ১১

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

"যে লোক চুগল করে বেড়ায় ও লোকদের মধ্যে ফিসফাস করে।" (সূরা ক্বালাম ৬৮:১১)

যদিও এই আয়াত সরাসরি গীবত নয়, তবে এর ব্যাখ্যায় অনেকে বলেন—চুগলখোরি ও গীবতের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই ধরনের চরিত্র আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।

৩. সূরা হুমাযাহ: আয়াত ১

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"ধ্বংস তাদের জন্য, যারা কটূক্তি করে ও পিছনে সমালোচনা করে।" (সূরা হুমাযাহ ১০৪:১)

এই আয়াতে গীবতের দুই রূপ উল্লেখ হয়েছে—হুমাযাহ (চোখের ইশারা ও কটূক্তি) ও লুমাযাহ (পেছনে দোষারোপ)। উভয়ই গীবতের অন্তর্ভুক্ত এবং ভয়ানক গুনাহ।

৪. সূরা আহযাব: আয়াত ৫৮

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়... তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা আহযাব ৩৩:৫৮)

গীবত একটি কষ্টদায়ক কাজ। কাউকে গোপনে অপমানিত বা ছোট করা মানে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানা। এই আয়াতে এমন আচরণের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

৫. সূরা বনি ইসরাইল: আয়াত ৩৬

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

"তোমার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, তার পেছনে অনুসরণ করো না।" (সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৩৬)

অনেক সময় মানুষ গীবত করে ভিত্তিহীন তথ্য বা অনুমানের উপর ভিত্তি করে। কুরআন এই মানসিকতার কঠোর প্রতিবাদ করেছে।

৬. সূরা নূর: আয়াত ১৫

تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ

"তোমরা নিজেদের জিহ্বা দিয়ে তা দ্রুত গ্রহন করো..." (সূরা নূর ২৪:১৫)

এই আয়াতটি মিথ্যা অভিযোগ ও গীবতের ভয়াবহ পরিণতির দিক নির্দেশ করে। মানুষের মুখ যত দ্রুত কথা ছড়ায়, তত দ্রুত গুনাহ জমা হয়।

কুরআনের বিভিন্ন সূরায় গীবত এবং সংশ্লিষ্ট কর্মের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি আয়াত মানুষের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উন্নতির আহ্বান জানায়। গীবত যে শুধু মানুষের সম্মান নষ্ট করে তাই নয়, বরং এটি আল্লাহর ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই আয়াতগুলো স্মরণ রাখা এবং জীবনে বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য।

❀গীবতের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

গীবত মানসিকতার একটি অপ্রিয় রূপ, যা মানুষের মধ্যে অসন্তোষ, ঈর্ষা, দুঃখ, এবং অক্ষমতার অনুভূতির ফলস্বরূপ ঘটে। এটি সাধারণত আমাদের অস্বস্তি, হীনমন্যতা বা অসন্তুষ্টির ফলস্বরূপ উৎপন্ন হয়, এবং ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসের অভাব অথবা অন্যের প্রতি অসন্তোষের কারণে তারা গীবতের মাধ্যমে তাদের অনুভূতিকে বাইরে নিয়ে আসে। গীবত মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে একটি বিষাক্ত প্রভাব সৃষ্টি করে, যা শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এক ধরনের বিপদ।

-গীবতের মনস্তাত্ত্বিক দিক

গীবতকে একটি মানসিক স্বাভাবিকতার চেয়ে বেশি হিসেবে দেখা উচিত, যেখানে মানুষের আত্মবিশ্বাসের সংকট, অবসাদ এবং হতাশা মূল ভূমিকা পালন করে। গীবত প্রায়ই মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা থেকে উদ্ভূত হয়, যা ব্যক্তি নিজেকে শক্তিশালী অনুভব করতে চায় বা অন্যদের প্রতি ক্রোধ ও ঈর্ষা প্রকাশ করতে চায়।

গীবত করার মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো:

1. আত্মবিশ্বাসের অভাব:

আত্মবিশ্বাসের অভাব গীবতের অন্যতম প্রধান কারণ। যখন একজন ব্যক্তি নিজের আত্মবিশ্বাসে অনিশ্চিত থাকে, সে তখন অন্যদের দুর্বলতা তুলে ধরতে চায় যেন সে নিজের অবস্থানকে আরো শক্তিশালী এবং উন্নত হিসেবে অনুভব করতে পারে।

2. হতাশা ও অপর্যাপ্ততা:

গীবত করার ফলে অনেক মানুষ তাদের হতাশা বা অপর্যাপ্ততার অনুভূতিকে চাপিয়ে রাখতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সে অন্যদের দুর্বলতা নিয়ে কথা বলে, যা তার নিজস্ব সমস্যার চাপ কমানোর মতো একটি কার্যকর উপায় মনে হয়।

3. ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা:

একে অপরের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং ঈর্ষা মানুষকে অন্যদের বিরুদ্ধে গীবত করতে উৎসাহিত করতে পারে। যখন কেউ নিজের অবস্থানকে অন্যের থেকে নিচু মনে করে, তখন তার মধ্যে ঈর্ষা উদিত হয়, এবং সে গীবতের মাধ্যমে সেই মানুষটির পতন দেখতে চায়।

4. সমাজে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা:

কখনও কখনও, গীবত করতে মানুষ শুধু সমাজে নিজেকে গ্রহণযোগ্য বা জনপ্রিয় করতে চায়। যখন গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যরা গীবত করে, তখন নিজের অবস্থান বজায় রাখতে বা সেই গোষ্ঠীতে নিজেদের মেনে নেওয়ার জন্য মানুষও গীবত করতে শুরু করতে পারে।

5. নিজের অক্ষমতা ঢাকার চেষ্টা:

গীবত অনেক সময় ব্যক্তির নিজস্ব অক্ষমতা বা দুর্বলতাকে ঢাকতে ব্যবহৃত হয়। যখন কেউ নিজে কোন কাজে সফল হতে পারে না, সে অন্যের ত্রুটির দিকে আঙুল তোলে, যাতে তার নিজের অক্ষমতা চোখে না পড়ে।

-গীবত করার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

গীবত যেহেতু একটি ক্ষতিকর এবং অস্থির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা সৃষ্টি করে, তার জন্য এটি মানুষের জীবনে নানা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। নিচে গীবত করার মানসিক পরিণতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

1. আত্মবিশ্বাসের ক্ষতি:

গীবত করা ব্যক্তি শুরুতে মনে করতে পারে যে এটি তাকে আরও শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করবে, তবে এটি আসলে আত্মবিশ্বাসের ক্ষতি করে। নিজের আত্মসম্মান এবং বিশ্বাসের অভাব তাকে অনিরাপদ এবং অসন্তুষ্ট করতে থাকে।

2. মনের অস্থিরতা:

গীবতকারী ব্যক্তি নিজেদের জন্য শান্তি বা আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেতে গীবত করে, কিন্তু এটি তাকে একটা অস্থির এবং মনস্তাত্ত্বিক অস্বস্তিতে ফেলতে থাকে। তার মনে অপরাধবোধ এবং পীড়া জাগিয়ে তোলে।

3. সম্পর্কের অবনতি:

গীবত করার ফলে সামাজিক সম্পর্কগুলোর অবনতি ঘটে। সম্পর্কগুলোর মধ্যে বিশ্বাস এবং সম্মান হারিয়ে যায়, কারণ গীবত করার কারণে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকে না। একে অপরের খুঁত বের করতে করতে সম্পর্ক দূরে সরে যেতে থাকে।

4. মানসিক দ্বন্দ্ব:
গীবতকারী ব্যক্তি অনেক সময় মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে, কারণ সে জানে যে এটি ভুল কাজ। কিন্তু তবুও সে অবচেতনভাবে অন্যদের সমালোচনা করতে থাকে, যার ফলে মানসিক অস্বস্তি তৈরি হয়।

5. সামাজিক বিচ্ছিন্নতা:
গীবত করতে করতে ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। যখন অন্যরা তার গীবত করার অভ্যাস জানে, তখন তারা তার সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেয় বা তাকে অপছন্দ করতে থাকে।

❁ গীবতের প্রকারভেদ

অনেকেই ভাবেন, শুধুমাত্র কারও অনুপস্থিতিতে দোষ বলা মানেই গীবত। অথচ গীবত বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায় এবং প্রতিটি রূপ শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও হারাম। এখানে গীবতের প্রকারভেদগুলো আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা হলো:

১. কথার মাধ্যমে গীবত
এটি গীবতের সবচেয়ে প্রচলিত ও প্রকাশ্য রূপ। মানুষ মুখ দিয়ে কারো চরিত্র, আচরণ, পারিবারিক অবস্থা, পোশাক, আচার-আচরণ ইত্যাদি নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করে যা ঐ ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে অপমানজনক হতো।
উদাহরণ:
"ওর বউ ভালো না", "ও খুব অহঙ্কারী", "ওর ছেলেটা বেয়াদব"—এ জাতীয় বাক্য গীবতের সীমানায় পড়ে।

কুরআনি রেফারেন্স:
وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُم بَعْضًا
"তোমাদের কেউ যেন অন্যের গীবত না করে।" (হুজুরাত ৪৯:১২)

২. অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে গীবত
শুধু মুখের ভাষা নয়, চোখের ইশারা, ঠোঁট বাঁকানো, মুচকি হাসি বা শরীরের ভঙ্গিমার মাধ্যমে অন্যকে উপহাস করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। কেউ কারও উচ্চতা, চলাফেরা, কথা বলার স্টাইল অনুকরণ করে হাসাহাসি করলে সেটিও গীবত।

হাদীস:

" الغيبة بالعين كالكلام"

"চোখের ইশারাও কথার মতো গীবত।" (মাওকুফ হাদিস)

৩. ইশারায় গীবত (সংকেতমূলক)

কথা না বলে শুধুমাত্র ইশারা বা সংকেত দিয়ে কাউকে ছোট করা যেমন—"তুমি তো জানো কেমন মানুষ", "তোমার কাছে ওর চরিত্র লুকানো নেই"—এসব বাক্যে কোনো নাম উল্লেখ না করলেও বুঝিয়ে দেওয়া হয়, যা গীবত হিসেবে পরিগণিত হয়।

হাদীস:

নবী (সা.) বলেন:

" إنَّ مِن أعظمِ الغِيبةِ أن تقولَ: فلانٌ كذا وكذا، وأنتَ تعنيَه".

"গীবতের সবচেয়ে খারাপ রূপ হচ্ছে, কাউকে বুঝিয়ে কিছু বলা অথচ তার নাম না নেওয়া।" (সহীহুল জামে)

৪. লেখা বা বার্তার মাধ্যমে গীবত

বর্তমানে গীবতের নতুন রূপ হলো ডিজিটাল মাধ্যমে গীবত—মেসেজ, ফেসবুক পোস্ট, কমেন্ট বা চ্যাটে কারো বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা লেখা, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মানহানি করে। অনেকে এমন লেখে—"তাদের পরিবার তো সবসময় এমন"—যা গীবত, যদিও নাম স্পষ্ট করা হয়নি।

কুরআনি সতর্কবাণী:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

"তোমার যার জ্ঞান নেই, তা অনুসরণ করো না।" (বনি ইসরাইল ১৭:৩৬)

৫. তাসাওউরী গীবত (কল্পনায় গীবত)

মন ও কল্পনায় যদি কেউ কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে এবং তা নিজের মধ্যে পোষণ করেই রেখে দেয়, সেটি সরাসরি গীবত না হলেও অন্তরে গীবতের বীজ। তবে যদি তা মনের ভাবনায় সীমাবদ্ধ না থেকে আচরণে প্রকাশ পায়, তখন তা গীবতের আওতায় পড়ে।

৬. হাস্যরস বা কৌতুক করে গীবত

অনেকে গীবতের মারাত্মকতা বোঝেন না এবং মজার ছলে অন্যের দোষ বলে বা উপহাস করে। যেমন: "আরে, ও তো হাঁটে হাঁসের মতো!" এই ধরণের কথার দ্বারা হাসি পেলেও এটি গীবত এবং ইসলামে হারাম।

হাদীস:

" ويلٌ لمن يُضحكُ القومَ ويغتابُ أخاه".

"ধ্বংস তার জন্য, যে লোক হাসানোর জন্য ভাইয়ের গীবত করে।" (আল-আদবুল মুফরাদ)

৭. প্রশ্ন আকারে গীবত

অনেক সময় কেউ এমন প্রশ্ন করে, যার মাঝে গীবত লুকায়িত থাকে। যেমন: "ওর পরীক্ষার রেজাল্ট শুনেছো?", "ও এখনো ওইখানেই কাজ করে?"—এসব প্রশ্নের মাধ্যমে নেতিবাচক ধারণা ছড়ানো হয়।

৮. আহসানের পর গীবত

অনেকে কাউকে সাহায্য করার পরে বলে বসে—"ওর অবস্থা এত খারাপ ছিল, না বললে বুঝতে না!" এটি গীবতের এক সূক্ষ্ম রূপ, কারণ এতে অন্যের দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে।

৯. প্রশংসার ছলে গীবত

কাউকে প্রশংসা করতে গিয়ে তার সাথে তুলনা করে অন্য কাউকে ছোট করে ফেলা, যেমন: "তুমি ওর মতো না, তুমি খুব ভালো"—এই বাক্য প্রশংসার ভেতর গীবত লুকানো।

১০. দ্ব্যর্থক বাক্যের গীবত

বাক্যে কিছু না বললেও, এমন ভাষা ব্যবহার করা যাতে লোকজন ভুল বুঝে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পায়। এটি সূক্ষ্ম কিন্তু মারাত্মক রকমের গীবত।

গীবতের প্রকারভেদ বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য সব সময় এক—অন্যের সম্মানহানি। ইসলাম গীবতের প্রতিটি রূপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। একজন প্রকৃত মুমিন সে, যে নিজের জিহ্বা ও আচরণ দ্বারা অন্য মুসলমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো গীবতের এসব সূক্ষ্ম ফাঁদ থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

❁গীবতের ধরন

গীবতের প্রকারভেদ বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে "গীবতের ধরন" বলতে বোঝানো হয় গীবত কিভাবে প্রকাশ পায় বা তার কার্যকারিতা কীভাবে ঘটে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে গীবতের ধরনকে কয়েকটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, যাতে মানুষ সহজে চিহ্নিত করতে পারে—সে বা অন্য কেউ কোন ধরণের গীবতে জড়িয়ে পড়ছে। নিচে গীবতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো:

১. ব্যক্তিকেন্দ্রিক গীবত

এটি সেই গীবত যার লক্ষ্য থাকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি। কারো চেহারা, পোশাক, স্বভাব, কথাবার্তা, পারিবারিক অবস্থা, শিক্ষা, চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করা এই ধরনে পড়ে।

উদাহরণ:

"ও খুব কৃপণ", "ওর মেয়ে অসভ্য", "ওর ভাই জেলে গিয়েছিল"—এসব বাক্য দ্বারা ব্যক্তিকে অপমান করা হয়।

আয়াত:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

"তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে।" (সূরা হুজুরাত ৪৯:১২)

২. গোষ্ঠীকেন্দ্রিক গীবত

যখন কেউ একটি পুরো পরিবার, বংশ, পেশা বা জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে গীবত করে, তখন সেটি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক গীবতের আওতায় পড়ে।

উদাহরণ:

"ওদের পুরো পরিবারই চতুর", "ওরা সবাই দুনিয়াদার", "ওদের গ্রামের মানুষ কেউ ভরসার নয়"—এই জাতীয় কথা গোষ্ঠীগত গীবতের রূপ।

হাদীস:

" مَن قال في قومٍ ما يكرهون، فقد اغتابهم"

"যে ব্যক্তি কোনো গোষ্ঠী সম্পর্কে এমন কিছু বলে যা তারা অপছন্দ করে, সে তাদের গীবত করল।" (মিশকাত)

৩. প্রকাশ্য গীবত

এই ধরনে গীবত এমনভাবে করা হয় যাতে অন্যরাও জানে যে কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে। সাধারণত এটি জনসমক্ষে, বন্ধুদের মাঝে বা সামাজিক প্ল্যাটফর্মে করা হয়।

উদাহরণ:

ফেসবুকে কারো নাম নিয়ে অপবাদ দেওয়া, কোনো মিটিংয়ে কারো ভুল নিয়ে ব্যঙ্গ করা।

৪. গোপন গীবত

এই ধরনে গীবত হয় নিরবধি বা একান্তভাবে, যেখানে খুব কাছের বন্ধু বা আত্মীয়ের মাঝে বলা হয়:

"তুমি কাউকে বলো না, কিন্তু ওর ব্যাপারে একটা কথা বলি..."

এই ধরণের গীবত হয়তো সীমিত শ্রোতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু ক্ষতির দিক থেকে কোনো কম নয়।

৫. ধর্মীয় রূপের গীবত

অনেকে ধর্মীয় আবরণে গীবত করে। যেমন:

"আল্লাহ যেন তাকে হেদায়েত দেন, ও খুব খারাপ পথে চলে গেছে।"

আবার বলা হয়: "আমি নামাজের জন্য বলেছিলাম, ও কেমন রেগে গেল, বুঝতেই পারো!"

এ ধরণের কথার মাধ্যমে নিজের ধার্মিকতা জাহির করে অন্যের দোষ তুলে ধরা হয়।

হাদীস:

" يا معشرَ من آمنَ بلسانهِ ولم يدخلِ الإيمانُ قلبَهُ، لا تغتابوا المسلمين"

"তোমরা যারা মুখে ঈমান এনেছো, কিন্তু হৃদয়ে প্রবেশ করায়নি—তোমরা মুসলিমদের গীবত কোরো না।" (আবু দাউদ)

৬. ন্যায়ের ছলে গীবত

অনেকে বলেন, "আমি সত্যই বলছি", "ওর মঙ্গল চাই বলেই বলছি"—এইসব ন্যায়ের ভাষায় অনেকেই গীবতকে হালাল করে ফেলে।

উদাহরণ:

"আমি চাই না ওর ক্ষতি হোক, কিন্তু ওর আচরণ খুব খারাপ"—এইরকম কথা বলার ভেতরেও গীবতের কৌশলী রূপ রয়েছে।

৭. প্রতিহিংসাপরায়ণ গীবত

কোনো ব্যক্তি যদি পূর্ববিরোধ, হিংসা বা রাগের বশে কাউকে ছোট করে, দোষ খোঁজে বা অন্যদের কাছে সমালোচনা করে, তখন এটি হয় প্রতিহিংসা-প্রসূত গীবত। এর মাধ্যমে একে অপরের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়।

কুরআন সতর্ক করে:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"মানুষের সাথে উত্তম কথা বলো।" (বাকারা ২:৮৩)

৮. অজ্ঞতাবশত গীবত

অনেক সময় কেউ না জেনেই গীবত করে ফেলে। বিশেষ করে যারা ইসলামি জ্ঞান থেকে দূরে, তারা সাধারণ কথাবার্তার মাঝে গীবত করে এবং মনে করে এটা কোনো সমস্যা না।

হাদীস:

নবী (সা.) বলেন:

" أتدرون ما الغيبة"؟

"তোমরা কি জানো গীবত কী?" (সহীহ মুসলিম)

তাই গীবতের ধরন যত রকমই হোক না কেন, ইসলামে সবই নিষিদ্ধ এবং নিন্দনীয়। ইসলামী আদর্শ হলো—যে কথা অন্য কেউ নিজের অনুপস্থিতিতে শুনলে কষ্ট পাবে, তা না বলা। একটি মুমিন হৃদয় গীবত থেকে নিজেকে বাঁচায় এবং সমাজে শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা দেয়।

গীবতের কারণে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি

গীবত (Backbiting) ইসলামী শরিয়তের একটি গুরুতর অপরাধ, যা শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি করে না, বরং এর গভীর প্রভাব মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, শান্তি, এবং সামাজিক সংহতির উপরও পড়ে। গীবতের কারণে মুসলিম সমাজের একতা ভেঙে যায়, সম্পর্কের অবনতি ঘটে, এবং শত্রুতা ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর ফলে, মুসলিম উম্মাহ একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা হারিয়ে ফেলে, যা সমাজের ভিতরে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে।
এটি ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ধ্বংস করার পাশাপাশি বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্ককেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর মাধ্যমে, মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে থাকে, যা পরবর্তীতে সমাজে বিভাজন এবং দ্বন্দ্বের কারণ হয়।

১. মুসলিম সমাজে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব:

গীবত করার ফলে প্রথমত মুসলিম সমাজের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের অভাব সৃষ্টি হয়। একজন মুসলিম যখন অন্য মুসলিমের বিরুদ্ধে গীবত করে, তখন তার প্রতি অন্যদের বিশ্বাস কমে যায়। এটি সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহের জন্ম দেয় এবং সামাজিক আন্তঃসম্পর্কগুলো দুর্বল

হয়ে পড়ে। একে অপরের প্রতি আস্থা হারানোর ফলে মুসলিম সমাজের ভিতরে এক ধরনের সামাজিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে বিভক্তি ও দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
গীবতের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরলে তা শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে না, বরং পুরো সমাজে এক ধরনের বিশ্বাসের সংকট তৈরি করে। পরবর্তীতে, সমাজের সদস্যরা একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে এবং তা পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

২. অবিশ্বাস এবং শত্রুতার বৃদ্ধি:
গীবত সমাজে অবিশ্বাস এবং শত্রুতার সৃষ্টি করে। যখন একজন ব্যক্তি অপরজনের বিরুদ্ধে গীবত করে, তখন তাদের সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই বিরোধ সমাজে আরও বিভাজন সৃষ্টি করে। একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গীবত করা অপরজনের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার জন্ম দেয়, যা একে অপরকে শত্রু হিসেবে দেখতে শুরু করে। একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলার মাধ্যমে গীবতকারী একজনকে অন্যের কাছে খারাপ বা নেতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করে, যা তাদের সম্পর্কের মধ্যে চিরস্থায়ী বিভাজন সৃষ্টি করে। এর ফলে, উম্মাহর মধ্যে শান্তি এবং ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়।
এছাড়া, গীবতকারী সাধারণত এই ধরনের অপপ্রচার ছড়িয়ে দিয়ে নিজের অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা করে, যা অন্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং সমাজের ভিতরে বিভক্তির বিস্তার ঘটায়।

৩. দলীয় বিভাজন এবং সামাজিক অস্থিরতা:
গীবত মুসলিম সমাজে দলীয় বিভাজন এবং সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করতে সহায়তা করে। এক ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তির ত্রুটি বা দুর্বলতা সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে, তখন তা মুসলিমদের মধ্যে মিথ্যা ধারণা এবং ভুল মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে। সমাজের মধ্যে একে অপরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয় এবং এটি গ্রুপ বা সম্প্রদায়ভিত্তিক সম্পর্কের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে।
যখন সমাজের ভিতরে বিভক্তি এবং শত্রুতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন মুসলিম উম্মাহর ঐক্যহীনতা আরও বৃদ্ধি পায়। এসব বিভাজন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে, যা একটি জাতির শান্তি এবং স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

৪. সহানুভূতির অভাব এবং মানবিক সম্পর্কের ক্ষতি:
গীবত সমাজে সহানুভূতির অভাব সৃষ্টি করে। যখন একজন ব্যক্তি অপরজনের বিরুদ্ধে গীবত করে, তখন তারা আরেকজনের অবস্থান এবং তার যন্ত্রণা বা কষ্ট অনুভব করতে পারে না।

এর ফলে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সহানুভূতির অভাব সৃষ্টি হয়, যা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ক্ষতি ঘটায়। গীবতকারীরা সাধারণত তাদের নিজের সমস্যাগুলো সঠিকভাবে বুঝতে চায় না এবং অপরের সমস্যা সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে। এটি পুরো সমাজে এক ধরনের প্রতিকূল মনোভাব তৈরি করে, যার ফলে মানুষের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক কমে যায়। এটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এক ধরনের শীতলতা এবং নীরবতা সৃষ্টি করে। সম্পর্কের মধ্যে ঐক্য এবং ভালোবাসা কমে গিয়ে, সকলেই নিজের স্বার্থের পেছনে দৌড়ে, সমাজের মধ্যে একে অপরের প্রতি সহানুভূতির জায়গা কমে যায়।

৫. মুসলিম উম্মাহর ঐক্যহীনতা এবং সমন্বয়ের অভাব:

গীবতের ফলে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্যহীনতা এবং সমন্বয়ের অভাব সৃষ্টি হয়। মুসলিমরা যখন একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা কমে যায়। উম্মাহর সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে ব্যর্থ হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিরোধের মধ্যে লিপ্ত থাকে। এর ফলে, এক জাতি হিসেবে তাদের উন্নতি থমকে যায় এবং তারা নিজেদের সামগ্রিকভাবে সমাজে এবং বিশ্বের মধ্যে শক্তিশালী অবস্থানে রাখতে পারছে না।

৬. ভুল ধারণা এবং মিথ্যা তথ্যের বিস্তার:

গীবত মাঝে মাঝে ভুল ধারণা এবং মিথ্যা তথ্যের বিস্তার ঘটাতে পারে। যখন একজন ব্যক্তি অপরের বিরুদ্ধে গীবত করে, তখন তা সমাজে ভুল ধারণা এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরনের অপপ্রচার পরবর্তীতে একে অপরের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা জন্মায়, যার ফলে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আরও বিভাজন সৃষ্টি হয়। এটি মুসলিম উম্মাহকে একটি দুভাগে বিভক্ত করে দেয়, যেখানে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস কমে যায় এবং শত্রুতা বৃদ্ধি পায়।

৭. আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং প্রতিকার:

গীবত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করার পাশাপাশি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণও হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে এবং একতা বজায় রাখতে বলেছেন। গীবত করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়, বরং এর ফলে উম্মাহর মধ্যে অশান্তি ও অস্থিরতা তৈরি হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সতর্ক করেছেন গীবত থেকে বিরত থাকার জন্য, কারণ এটি আমাদের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং উম্মাহর ঐক্যকে দুর্বল করে দেয়।

গীবত শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর নয়, এটি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্যহীনতা, সন্দেহ, এবং বিভক্তি সৃষ্টি করে। গীবতের কারণে মুসলিম সমাজে শত্রুতা, বিদ্বেষ এবং ভুল ধারণার জন্ম নেয়, যা দীর্ঘমেয়াদে উম্মাহর শান্তি এবং সমন্বয়ের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল ﷺ আমাদের গীবত থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যাতে আমরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং ঐক্য বজায় রাখতে পারি। একমাত্র এইভাবে মুসলিম উম্মাহ তার শক্তি, ঐক্য এবং সম্মান রক্ষা করতে পারে।

❁ যে সব উপায়ে গীবত হয়ে থাকে

গীবত এর সূচনা হয় মানুষের অন্তরের কুটিলতা থেকে এবং বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন মাধ্যমে। মানুষ মুখে উচ্চারণ না করেও গীবতের মধ্যে লিপ্ত হতে পারে। ইসলামী শিক্ষায় গীবত শুধু মুখের কথার মাধ্যমে হয় না, বরং তা হতে পারে বহু উপায়ে—যা অনেক সময় নিজের অজান্তেই ঘটে যায়। এখানে এমন কিছু পদ্ধতি আলোচনা করা হলো যেগুলো দ্বারা মানুষ গীবতের গোনাহে জড়িয়ে পড়ে।

১. খোঁজ নেওয়ার ছলে কারো বদনাম করা

অনেকেই গীবতকে আড়াল করার জন্য বলে, “আমি তো শুধু খোঁজ নিচ্ছি” বা “তথ্য জানতে চাচ্ছি”—এই ছলে কারো অপমানজনক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি গীবতেরই একটি সূক্ষ্ম রূপ। উদাহরণস্বরূপ: “সে তো আগে খুব অন্যরকম ছিল, এখন কীভাবে হুজুর হলো?”—এটা গীবত, কারণ এতে সে ব্যক্তির অতীত দোষ তুলে ধরা হচ্ছে।

২. সাহায্য চাওয়ার নামে দোষ প্রকাশ

কেউ কাউকে বলছে: “আমি খুব কষ্টে আছি, অমুক মানুষ আমাকে খুব কষ্ট দেয়”—এই কথায় যদি সে লোকটির গোপন দোষ বা দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তাহলে সেটাও গীবতের মধ্যে পড়ে। সাহায্যের নামে গীবতের এই ধরন অনেক সময় আমাদের অজান্তেই ঘটে থাকে।

৩. দোয়ার সময় কারো দোষ উল্লেখ করা

কখনো দেখা যায়, কেউ দোয়া করছে: “হে আল্লাহ, অমুককে হিদায়াত দিন, সে তো বড়ই মুনাফিক।” এমনভাবে দোয়া করা যার মাধ্যমে অন্যের দোষ প্রকাশ পায়, সেটাও গীবতের একটি উপায় হয়ে যায়। ইসলামে দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের শুদ্ধতা, অন্যের কল্যাণ—not নিন্দা।

৪. উপদেশ দেওয়ার সময় কারো ভুল তুলে ধরা

অনেকে কাউকে নসিহত করার সময় বলে: “তুমি তো ঠিক অমুকের মতো আচরণ করছো, সে তো ধোঁকাবাজ।” এই ধরণের তুলনা বা মন্তব্য সরাসরি গীবত হিসেবে গণ্য হয়, কারণ এতে অন্যের দোষ উন্মোচিত হচ্ছে, যদিও উদ্দেশ্য হয়তো উপদেশ দেওয়া।

৫. নিজের ভালো প্রমাণ করতে গিয়ে অন্যকে খাটো করা

কেউ বলছে, “আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো কখনো কারো সঙ্গে প্রতারণা করিনি, যেমন অমুক করে”—এই ধরণের বক্তব্য গীবতের একটি আত্ম-প্রশংসামূলক উপায়। এতে নিজের গুণ বলার ছলে অন্যের দোষ প্রচার হয়, যা গীবতেরই নামান্তর।

৬. কারো কথা বলার পর 'নাম না বলি' বলে ইঙ্গিত করা

এই ধরণের বাক্য খুব সাধারণ: “নাম বলবো না, কিন্তু আমাদের ক্লাসে এক ভাই আছে যে খুব ঝগড়াটে”—এভাবে নাম না বললেও ইঙ্গিত করে যদি বোঝা যায় কে সেই ব্যক্তি, তবে তা গীবতের গোনাহ থেকে মুক্ত নয়।

৭. কোনো বৈঠকে অন্যের বদনাম চলা অবস্থায় চুপ থাকা

গীবতের আসরে উপস্থিত থেকে চুপ থাকা, প্রশ্রয় দেওয়া, বা হাস্যকর ভঙ্গিতে মজা পাওয়া—এগুলোও গীবতের শামিল। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন:

" وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ"...

“...যখন আল্লাহর আয়াত নিয়ে উপহাস হয়, তখন তাতে বসে থেকো না।” (সূরা আন-নিসা ৪:১৪০)

৮. আত্মীয় বা পরিচিতদের কাহিনি বলে “শিক্ষা” দেওয়ার নামে গীবত

কেউ বক্তব্য দিচ্ছে বা উপদেশ দিচ্ছে, হঠাৎ বলে: “একজন আত্মীয় ছিল, সে এমন এমন খারাপ কাজ করত”—এইরকমভাবে কারো পরিচিত হওয়া বা তথ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার ছলে গীবত করে বসে।

৯.নামাজ/ইবাদতের মাঝে মন থেকে গীবত চলা

গীবত শুধু মুখে নয়, অন্তরের মাঝেও হতে পারে। কেউ হয়তো নামাজে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু মন বলছে—“অমুক তো খারাপ, মুনাফিক”—এই অন্তর্নিহিত কল্পনা বা ভাবনাও একধরনের গীবতের সূচনা, যা থেকে হেফাজত থাকা জরুরি।

গীবতের পথ কেবল কথায় সীমাবদ্ধ নয়। দৃষ্টি, দেহভঙ্গি, দোয়ার ভাষা, উপদেশের ধরন, এমনকি নিঃশব্দ উপস্থিতি পর্যন্ত গীবতের আওতায় পড়তে পারে। একজন সৎ মুমিনের দায়িত্ব হলো, গীবতের সবরকম সূক্ষ্ম উপায় চিহ্নিত করে নিজেকে সেগুলো থেকে বাঁচানো।

রাসূল (সা.) বলেন:

" من وقاهُ اللهُ شرَّ ما بينَ لَحيَيهِ، وشرَّ ما بينَ رجليهِ، دخلَ الجنَّةَ"

"যাকে আল্লাহ জিহ্বা ও যৌনত্বের গোনাহ থেকে বাঁচালেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করল।" (তিরমিজি)

ꕥ গীবতে লিপ্ত হবার কারণ

১. অহংকার ও গর্ব

নিজের ক্ষমতা, শেখানো বা অবস্থানের অহংকার থেকে অন্যদের তুচ্ছ করে দেখা। উদাহরণ: অফিসে পদোন্নতির পরে সহকর্মীদের সামান্য ভুল ধরিয়ে দিতে বসা।

রেফারেন্স: "وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُم بَعْضًا" (হুজুরাত ৪৯:১২)

২. অসন্তুষ্টি বা ঈর্ষা

কারো সাফল্য দেখে কষ্ট পেয়ে তার গোপন বা প্রকাশ্য খারাপ দিক উন্মোচন। উদাহরণ: বন্ধুর নতুন ব্যবসা ভালো চলছে দেখে তার পুরনো ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা।

৩. মনোরঞ্জন বা বিনোদন

পার্টিতে, মহফিলে মজায় বা হালকা ফিসফাসি-টিপসি করতে গিয়ে গীবত। উদাহরণ: ঘরোয়া আড্ডায় "তাদের বাড়িতে কী হয়, জানলে মজা পাবে" বলে দোষ করা।

৪. প্রতিহিংসা

আগের বিরোধের প্রতিশোধ হিসেবে গোপনে অন্যকে ছোট করা। উদাহরণ: পয়মর্শের সময় প্রতিপক্ষের ব্যক্তিগত বিষয় ফাঁস করা।

৫. অজ্ঞানতাবশত

ইসলামী জ্ঞানহীনতা, ছোটখাটো কথায় গীবতকে বুঝে না ওঠা। উদাহরণ: "সে তো আজকাল বেশ চাপাচাপি" বলে কারো আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা।

৬. অপ্রয়োজনীয় অনুসন্ধান

"তুই তো জানিস ও কী করে" বলে বন্ধুর অতীতে যাওয়া বা ব্যক্তিগত তথ্য জিজ্ঞেস করে দোষ খুঁজে বের করা।

৭. উপদেশের আড়ালে

নসীহতের ছলে কারো দুর্বলতা তুলে ধরা, যেমন: "আমি তো নামাজি, ওর নামাজ দেখলি?"—উপদেশের নামে গীবত।

৮. সামাজিক মর্যাদার হাড়ে মাংস খোঁজা

কারো পদ-পদবী, পশ্চিমা বা সামাজিক অবস্থান নিয়ে খুনসুটি; উদাহরণ: "সে তো বউ-মেয়ে নিয়ে খুব গর্ব করে" বলে হাসাহাসি।

৯. অস্বাস্থ্যকর গোষ্ঠীবদ্ধ আলোচনা

গোষ্ঠী বা ক্লিকের মধ্যে বন্ধুত্ব জমাতে কারো বিরুদ্ধে গীবত চালানো; উদাহরণ: "ওরা আর আমাদের দলের মতো নয়" বলে দলভেদ উসকে দেওয়া।

১০. কুসংস্কারমুখী আলোচনা

অনুমান বা গুজব-ভিত্তিক কথায় গীবত; উদাহরণ: "শোনা যায় ওর বাড়িতে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে" বলে ভয়-ভাঙ্গানো কথা ছড়ানো।

১১. আত্মপ্রশংসার ছলে

"আমি তো কখনো এরকম হই না, তোর দেখেছিস মাঝে" বলেই অন্যের দোষ উপস্থাপন করা।

১২. রূপক বা উপমার ব্যবহার

সরাসরি নাম না বলে "নিশ্ছয় এক জন আছে, মাছের মতো নীরস" ইঙ্গিতে অপমান প্রকাশ।

১৩. গোপন সমর্থন বা নীরব সম্মতি

গীবতের আসরে বসে চুপ থাকা ও হাস্যরসে অংশ নেওয়া; এতে আপনি কথায় অংশ না নিলেও দোষের সহকারি।

হাদীস: "المُستمعُ أحدُ المُغتابين"َ

১৪. মনের অপরিবর্তিত ভাবনা

মুখে না বলে হৃদয়ে ধারালো নেতিবাচক চিন্তা রাখা—যদি তা প্রকাশের পথে গড়ায়, তা গীবতের সূত্রপাত।

۞ গীবত করার পরিণাম

গীবত নিঃশব্দ বিষের মতো, যা কোনো মানুষের দেহ নয়, বরং আত্মা ও সমাজকে ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত করে।এই পাপের ভয়াবহতা শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, নৈতিক, সামাজিক এবং আত্মিক দিক থেকেও অপরিসীম ক্ষতিকর।

১. আত্মিক অপবিত্রতা ও ঈমানের দুর্বলতা

গীবতের অভ্যাস একজন মুসলমানকে ধীরে ধীরে তার আত্মিক পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত করে। কেউ যখন অন্যের গোপন দোষ বা দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করে, তখন তার হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি ও পরিশুদ্ধতা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে সে গুনাহের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয় এবং ধীরে ধীরে তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে।

আয়াত:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

"নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে।" (সূরা আশ্‌-শামস, ৯১:৯)

গীবতের মতো গোপন পাপ আত্মাকে কলুষিত করে এবং সেই 'নফসের পরিশুদ্ধতা'র বিপরীত পথে পরিচালিত করে।

২. বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি

একজন ব্যক্তি যখন কারো পেছনে গীবত করে, তা সরাসরি তার সাথে থাকা পারস্পরিক সম্পর্ক ও আস্থার ভীতকে নষ্ট করে। এই ধরনের কথাবার্তা জানাজানি হলে বন্ধুত্ব ধ্বংস হয়ে যায়, দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সন্দেহ ও ঘৃণা জন্ম নেয়।

উদাহরণ:

একজন সহকর্মী যদি অন্য একজনের পিছনে গীবত করে—"সে কাজ কিছুই পারে না, বসের সামনে শুধু অভিনয় করে"—তবে এটি জানাজানি হলে তাদের মধ্যে আর সহযোগিতার সম্পর্ক থাকে না। এমনকি কথা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

হাদীস (ছোট):

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

"চুগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী)

এটি প্রমাণ করে, পরনিন্দা ও গীবত শুধুমাত্র দুনিয়ায় ক্ষতির কারণ নয়, বরং তা আখিরাতের দরজাও বন্ধ করে দিতে পারে।

৩. সামাজিক অস্থিরতা ও দলাদলি সৃষ্টি হয়

গীবতের অন্যতম ভয়াবহ পরিণতি হলো—সমাজে ফাটল সৃষ্টি হয়। মানুষ যখন একে অপরের পেছনে দোষ খুঁজে ও বলে বেড়ায়, তখন সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। গীবতকারীর কারণে এক পক্ষ আরেক পক্ষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। এই দলাদলি রাজনীতি, সমাজসেবা এমনকি ধর্মীয় মহলেও ছড়িয়ে পড়ে।

আয়াত:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং বিবাদ করো না, যাতে তোমরা ব্যর্থ না হও।" (সূরা আনফাল, ৮:৪৬)

গীবত সরাসরি এই "বিবাদ"-এর সূচনা করে, যা মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল করে তোলে।

৪. অন্তরে হিংসা, রাগ ও দ্বেষ জন্ম নেয়

গীবতের একটি গভীর পরিণতি হলো—এই পাপের মধ্য দিয়ে গীবতকারী নিজের ভেতর হিংসা, বিদ্বেষ, রাগ ইত্যাদি নেতিবাচক অনুভূতি পুষে রাখে। এতে তার নিজের মানসিক শান্তি নষ্ট হয় এবং সে ধীরে ধীরে এক অসন্তুষ্ট, কুণ্ঠিত ব্যক্তি হয়ে পড়ে।

হাদীস:

الحَسَدُ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحَطَبَ

"হিংসা যেমন আগুন কাঠ খেয়ে ফেলে, তেমনি এটি নেক আমল নষ্ট করে দেয়।" (আবু দাউদ)

গীবতের জন্মস্থানই হচ্ছে হিংসা ও রাগ—যা এক ব্যক্তিকে তার আমল থেকে বঞ্চিত করে।

৫. নিজের আমল অন্যের খাতায় চলে যায়

যে ব্যক্তি গীবত করে, সে হয়তো জানেই না—তার এই কু-কর্ম দ্বারা তার বহু বছরের ইবাদত, দান-সদকা, নামাজ-রোজা—all শেষ হয়ে যাচ্ছে, এবং সেই আমল চলে যাচ্ছে যার গীবত করা হয়েছে তার নামে।

হাদীস:

أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟... مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا... فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ

"তোমরা জানো, কে দীনহীন? সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা নিয়ে আসবে,

কিন্তু অন্যকে গালাগাল, অপমান করেছে... তার নেক আমল দিয়ে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।" (সহীহ মুসলিম)

এমন ভয়াবহ লেনদেন—যেখানে নিজের গীবতের জন্য নেক আমল দিতে হয়—তুলনাহীন শাস্তি।

৬. নিজের ব্যক্তিত্বের মলিনতা ও সম্মানহানি

গীবতকারী ব্যক্তি তার সমাজে একটি খারাপ ইমেজ তৈরি করে। তার আশপাশের মানুষ ধীরে ধীরে তাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে, তার কথায় গুরুত্ব দেয় না। এমনকি তার কাছের মানুষরাও দূরে সরে যায়। এতে সে একা হয়ে পড়ে, মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

হাদীস:

مَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

"যে মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের দোষ গোপন রাখেন।" (মুসলিম)

গীবত করে অন্যের দোষ প্রকাশ করলে মানুষ যেমন তাকে অবিশ্বাস করে, তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকেও সে গোপন রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

গীবত করার পরিণাম শুধু আখিরাতেই সীমাবদ্ধ নয়—বরং দুনিয়াতে এর প্রতিফলন প্রতিটি দিন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। মানুষ তার আত্মিক শান্তি হারায়, সম্পর্ক ভেঙে পড়ে, সম্মান চলে যায়, সমাজে বিভাজন সৃষ্টি হয়। আর সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে—নিজের আমল অন্যের খাতায় চলে যায়। গীবতের ভয়াবহতা তাই অবহেলা করার মতো কিছু নয়। এ থেকে বাঁচতে হলে চাই অন্তরের পরিশুদ্ধি, আল্লাহভীতি ও চিন্তা করে কথা বলার অভ্যাস।

❁ গীবতের কারণে কবরে ও আখিরাতের শাস্তি

গীবত ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুতর একটি পাপ, যা শুধু ব্যক্তি সম্পর্কের ক্ষতি করে না, বরং এর পরিণতি একান্ত ভয়াবহ আখিরাতে ও কবরে শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামে গীবত করার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন, এবং এই শাস্তি কেবল পার্থিব জীবনেই নয়, বরং পরকালের শাস্তিতেও ভুগতে হবে। গীবত শুধু মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না, এটি পরকালে এক কঠিন শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১. গীবতের শাস্তি কবরে:

গীবতকারীর জন্য কবরে শাস্তির বিষয়ের প্রমাণ আমরা হাদিসে দেখতে পাই।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে গীবত করবে, তার দেহ কবরে এমন একটি সত্ত্বা দ্বারা খাচ্ছে যা তাকে শাস্তি দেবে।" (তিরমিজি)

এই হাদিসটি ইঙ্গিত দেয় যে, গীবতকারী ব্যক্তি কবরে শাস্তি ভোগ করবে, কারণ গীবত একটি মারাত্মক অপরাধ যা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানেই শাস্তির মুখে পড়াতে পারে।

২. গীবতের শাস্তি আখিরাতে:

গীবতের পরিণতি আখিরাতে আরো ভয়াবহ। হাদিসের মধ্যে এই শাস্তির বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল ﷺ পরিষ্কারভাবে বার্তা দিয়েছেন।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে গীবত করে, সে আখিরাতে তাঁর গীবত করার ব্যক্তির বদলা হিসেবে গোপন দোষ বের করার শাস্তি ভোগ করবে।" (বুখারি ও মুসলিম)

অর্থাৎ, গীবতকারীর শাস্তি আখিরাতে ততটাই ভয়াবহ যে, তার সমস্ত দোষ আখিরাতে বের হবে এবং তাকে এর বদলা দিতে হবে। বিশেষত, যে ব্যক্তি অপরের সম্বন্ধে গীবত করেছে, আখিরাতে তার সমস্ত দোষ জনসমক্ষে আনা হবে।

৩. গীবতকারীর জন্য মৃত্যুর পর শাস্তির ভয়:

গীবতকারীর জন্য মৃত্যুর পর শাস্তি যে কেবল কবরে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং আখিরাতেও এক কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, তার প্রমাণ কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে গীবত করে, আখিরাতে তার শাস্তি তার মুখের গোপন দোষ প্রকাশের মাধ্যমে হবে।" (তিরমিজি)

এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, গীবতকারীর পাপের শাস্তি আখিরাতে পাবেন এবং তার পাপসমূহ জনসমক্ষে প্রকাশিত হবে। এর পরিণতি হলো তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং সে গীবত করার জন্য অপদস্থ হবে।

৪. গীবতকারীর জন্য ঝামেলা ও লজ্জা:

গীবতকারীর জন্য আখিরাতে একটি বড় ঝামেলা সৃষ্টি হবে, যা তাকে তার সমস্ত পাপের পাপী হিসেবে প্রকাশিত করবে।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

> "যারা গীবত এবং চুগলখোরি করে, তাদের জন্য রয়েছে দুঃখময় শাস্তি।" (সূরা হুজুরাত: ১২)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা গীবতকারী ও চুগলখোরের জন্য ভয়াবহ শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা আখিরাতে সঠিক সময়ে তাকে ভোগ করতে হবে। তার সকল গোনাহসহ আখিরাতের শাস্তি তাকে সম্মুখীন হতে হবে।

৫. জাহান্নামে স্থান পাওয়া:

গীবত এমন একটি অপরাধ যা জাহান্নামের শাস্তির কারণ হতে পারে। এটি কুরআনে এবং হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি গীবত করে, তার পাপের হিসাব আল্লাহ তায়ালা নেয়, এবং তাকে জাহান্নামে পুরানো গোশতের মতো শাস্তি দেওয়া হবে।" (বুখারি)

এখানে এটি স্পষ্ট যে, গীবতকারীদের জন্য পরকালে শাস্তি অপেক্ষা করছে, যার মধ্যে একটি বড় শাস্তি হতে পারে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো। এটি একটি ভয়াবহ শাস্তি যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা নিজেই ন্যায্যভাবে বিচার করবেন।

৬. গীবতকারীর জন্য সঠিক তওবা:

যদিও গীবত একটি বড় পাপ, তবুও যে কেউ তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। তবে তওবা করতে হবে আন্তরিকভাবে এবং অপরাধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি গীবত করেছে এবং তার জন্য তওবা করেছে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।" (আবু দাউদ)

তবে, তওবাতে আল্লাহর কাছে পূর্ণ নিবেদিত হতে হবে এবং তার অপরাধের জন্য অন্যজনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, কারণ গীবত ব্যক্তিগত ক্ষতির পাশাপাশি অন্যের অধিকারেও আঘাত আনে।

৭. গীবত এবং দয়া:

গীবত এমন এক অপরাধ, যা মানুষকে একে অপরের প্রতি দয়াশীল হতে বাধা দেয়। গীবত মানুষকে একে অপরকে নিন্দা ও সমালোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে, যা একে অপরের প্রতি

সহানুভূতির অভাব সৃষ্টি করে। ইসলাম দয়া এবং সহানুভূতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং গীবত এর বিপরীত।
গীবতের শাস্তি পরকালেও অত্যন্ত ভয়ংকর, এবং এটি কবরে ও আখিরাতে মুসলিমদের জন্য বড় ধরনের শাস্তির কারণ হতে পারে। এটি শুধুমাত্র একটি ব্যক্তি বা সামাজিক ক্ষতি নয়, বরং আল্লাহর কাছে একটি বড় পাপ হিসেবে গণ্য হয়। গীবত থেকে বাঁচার জন্য সর্বোপরি তওবা, পরকালীন শাস্তির ভয় এবং মানুষের অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।

ꕥ গীবতের ভয়াবহতা: অন্যান্য গুনাহর সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইসলাম আমাদের জীবনে পাপ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছে এবং একাধিক গুনাহকে চিহ্নিত করে তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেছে। কিন্তু কিছু গুনাহ এমন রয়েছে, যেগুলোর ক্ষতি নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে এবং গভীরভাবে আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়—তন্মধ্যে গীবত অন্যতম। অনেক মানুষ চুরি, জিনা, সুদের মতো গুনাহ থেকে তো দূরে থাকে, কিন্তু গীবতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে না। অথচ হাদীস ও কুরআনের আলোকে দেখা যায়, গীবতের ভয়াবহতা কিছু ক্ষেত্রে চেয়ে বড় এবং মারাত্মক।

নিচে ১২টি তুলনামূলক পয়েন্টে গীবতের ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করা হলে।

১. গীবত: নিঃশব্দ গোনাহ, অথচ বড় শাস্তিযোগ্য

চুরি বা জিনার মতো গোনাহ মানুষ প্রকাশ্যে দেখে, তাই সহজে অনুশোচনা হয়। কিন্তু গীবত মুখ দিয়ে হয়, চুপিচুপি হয়—তাই মানুষ গুরুত্ব না দিয়ে করে ফেলে। অথচ আল্লাহর কাছে এটি চুপচাপ হলেও অনেক বড় অপরাধ হিসেবে প্রকাশিত করবে।
কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন
> "তোমরা একে অপরের গীবত করো না; এটা এমন যেন তোমরা মৃত ভাইয়ের গোশত খাচ্ছ!"
(সূরা হুজুরাত: ১২)

২. গীবত বহু মানুষের অধিকার নষ্ট করে

জিনা বা চুরি হয় একজন বা দুটি মানুষের প্রতি, কিন্তু গীবতের মাধ্যমে একটি ব্যক্তির সম্মান, একটি পরিবারের মর্যাদা এমনকি একটি গোষ্ঠী পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গীবতকারীর পাপ বহুগুণে বেড়ে যায়।

৩. গীবতের জন্য ক্ষমা চাওয়ার পথ কঠিন

যদি কেউ গোপনে গীবত করে, তারপর সে তওবা করে—তবুও তাকে ঐ ব্যক্তির কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু গোপনে যিনি চুরি করেছেন, তার মাল ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা পাওয়া সহজতর। তাই গীবতের ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল।

৪. গীবত অন্যের সম্মান হত্যা করে

একজন মানুষকে হত্যা করলে তার শরীর মারা যায়, কিন্তু গীবত করলে তার চরিত্র ও সামাজিক মর্যাদাকে ধ্বংস করে ফেলা হয়।

তাই রাসূল ﷺ গীবতকে "ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো ভয়ংকর" বলেই বর্ণনা করেছেন।

৫. গীবতের শাস্তি দুনিয়া, কবর ও আখিরাত—তিন পর্বে

চুরি বা জিনার শাস্তি দুনিয়ায় হয়; কেউ ধরা পড়লে দণ্ডিত হয়। কিন্তু গীবতের শাস্তি শুধু দুনিয়ায় নয়, কবরে ও আখিরাতে অব্যাহত চলতে থাকে।

রাসূল ﷺ বলেছেন

> "আমি দুজন কবরবাসীকে দেখলাম, তারা কঠিন শাস্তিতে আছে। কারণ, একজন গীবত করত..."

(সহীহ বুখারি)

৬. গীবত, আমল নষ্ট করে দেয়

চুরি করলে কিছু পাপ হয়, কিন্তু গীবত করলে শুধু পাপ হয় না, সকল নেক আমল গীবতের শিকার ব্যক্তি পেয়ে যায়। এটিকে "রুহানী দেউলিয়াত্ব" বলা যায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন

> "কে দেউলিয়া জানো? যে অনেক নামাজ, রোজা, হজ করেও গীবতের কারণে দেউলিয়া হয়ে যায়।" (তিরমিজি)

৭. গীবত সমাজে দুশমনি ও বিভক্তি সৃষ্টি করে

চুরি বা জিনায় ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়, কিন্তু গীবতের মাধ্যমে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, এমনকি মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও বিভাজন ঘটে।

রাসূল ﷺ বলেছেন

> "গীবত উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করে।" (মুসলিম)

৮. গীবত দ্রুত ছড়ায়, সুদের চেয়ে ভয়ংকর

যেমন সুদ সমাজে অর্থনৈতিক বিষ ছড়ায়, গীবত সমাজে নৈতিক বিষ ছড়ায়। এবং এটি গুজব, অপবাদ ও ঘৃণার মাধ্যমে আগুনের মতো দ্রুত ছড়ায়।

৯. গীবত শয়তানের প্রিয় অস্ত্র

শয়তান মানুষকে ধীরে ধীরে পাপের দিকে নিয়ে যায়। সে জানে, গীবতের মাধ্যমে একটা ভালো পরিবেশ, বন্ধুত্ব, এমনকি আল্লাহভীরুতাও ধ্বংস করা যায়। এজন্য গীবতকে সে "হালকা কিন্তু মারাত্মক" পাপ হিসেবে সাজায়।

১০. গীবতের কারণে দোয়া ও ইবাদত বাতিল হতে পারে

চুরি বা মদপানকারী তাওবা করলে তার দোয়া কবুল হতে পারে। কিন্তু যারা নিয়মিত গীবত করে, আল্লাহ তাদের দোয়া এবং ইবাদতে বরকত রাখেন না—যতক্ষণ না তারা ক্ষমা চেয়ে নেয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন

> "তোমরা গীবত করলে, তোমাদের দোয়া আকাশে ওঠে না।" (ফুযায়েল ইবনে আয়ায)

১১. গীবত অনেক সময় সাদা পাপ বলে উপস্থাপিত হয়

চুরি, জিনা, সুদ—এসবকে সবাই ভয় পায়। কিন্তু গীবতকে মানুষ "সাধারণ কথা বলা" হিসেবে দেখে। অনেকে বলে—"আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি", অথচ সেটাই গীবত।

> রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: "গীবত কী?" সাহাবা বললেন, "ভুল কথা বলা"। তিনি বললেন, "না, সে যা করেছে সেটাই বলা, কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে।" (মুসলিম)

১২. গীবত নিজের আত্মাকে কলুষিত করে

গীবতের মাধ্যমে নিজের নফস ক্রমাগত দুশ্চিন্তা, হিংসা ও অপমান করার অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এটি আত্মিক রোগ হয়ে দাঁড়ায়, যা ধীরে ধীরে সকল ভালো গুণ ধ্বংস করে দেয়।

উপরের ১২টি তুলনায় স্পষ্ট বোঝা যায়, গীবত এমন এক ভয়ংকর পাপ যা নিঃশব্দে ব্যক্তি, সমাজ ও দীনকে ধ্বংস করে ফেলে। এটিকে চুরি, জিনা বা সুদের মতো বড় পাপ বললে কম বলা হবে—কারণ এটি সেইসব পাপের মতোই গুরুতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ গীবতকে হালকা ভাবে নেয়। তাই ইসলামি দৃষ্টিতে গীবতকে শুধু নিষিদ্ধ নয়, বরং আত্মঘাতী পাপ হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত।

❁রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে গীবত সম্পর্কিত শিক্ষা ও উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জীবন হলো মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি শুধু নীতি ও নির্দেশনা দিয়ে থেমে যাননি, বরং নিজ জীবনে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। গীবতের মতো সমাজ বিধ্বংসী পাপ সম্পর্কে তিনি যেমন কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন, তেমনি নিজের জীবনে এমন কিছু ঘটনাও রয়েছে যেখানে তিনি গীবতের পরিণতি এবং এর থেকে বাঁচার গুরুত্ব শিক্ষা দিয়েছেন।

১. গীবতের সংজ্ঞা প্রদান ও সঠিক বোঝানো

একদা সাহাবায়ে কেরামগণ জানতে চাইলেন গীবত আসলে কী?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

> "তুমি তোমার ভাইয়ের এমন দোষ বলো, যা সে অপছন্দ করে।"

সাহাবারা বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, যদি সেই দোষ তার মধ্যে সত্যিই থাকে?”

তিনি বললেন:

"যদি তা তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি গীবত করেছ। আর যদি তা না থাকে, তবে তুমি অপবাদ দিয়েছ।"

(মুসলিম: ২৫৮৯)

এই হাদীস দ্বারা তিনি গীবতের আসল প্রকৃতি স্পষ্ট করে দেন। শুধু "মিথ্যা বলা" নয়, কারো সত্যিকার দোষও অন্যের কাছে বলা—তাও গীবত।

২. রাসূল ﷺ-এর সামনে গীবত হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া

হাদিসে এসেছে, একবার এক মহিলা আয়েশা (রাঃ) আরেক মহিলা সম্পর্কে কিছু কটু ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন:

> "ওর কেমন নাক!"

রাসূল ﷺ তখন বললেন:

> "তুমি এমন কথা বললে, যা যদি সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হতো, তবে তা নষ্ট হয়ে যেত।"

(আবু দাউদ: ৪৮৭৫)

এর দ্বারা বোঝা যায়, সামান্য ইঙ্গিত বা ব্যঙ্গ করাও গীবতের পর্যায়ে পড়ে এবং তার প্রভাব এত ভয়াবহ যে তা বিশাল কিছু নষ্ট করে দিতে সক্ষম।

৩. গীবতকারীকে কবরের শাস্তির কথা বলে সতর্ক করা

রাসূল ﷺ একবার দুজন ব্যক্তির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন:

> "এই দুজন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, অথচ তারা ভাবত না যে তারা বড় কোনো গুনাহ করেছে। একজন প্রস্রাবে অসতর্ক ছিল, অন্যজন গীবত করত।"

(সহীহ বুখারি: ২১৬)

এই হাদীস দ্বারা রাসূল ﷺ স্পষ্ট করে দেন যে, গীবতের শাস্তি কবর থেকেই শুরু হয়। এবং মানুষ অনেক সময় এটিকে হালকা ভাবলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ভয়াবহ।

৪. গীবত বন্ধে রাসূল ﷺ-এর প্রশিক্ষণমূলক নীতি

রাসূল ﷺ কখনো গীবত শুনলে শুধু নিষেধ করে থেমে যেতেন না, বরং সেই ব্যক্তিকে সংশোধনের সুযোগ দিতেন।

যেমন, একবার সাহাবাদের কেউ কেউ এক গোষ্ঠীর সম্পর্কে বললেন, "ওরা অলস, তারা ঠিকভাবে কাজ করে না।"

রাসূল ﷺ বললেন:

> "তোমরা তাদের এমনভাবে বলো, যাতে তারা উৎসাহ পায়, যেন তারা অনুপ্রাণিত হয়।

এভাবে তিনি নেতিবাচক সমালোচনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তর করতেন। এটি একান্তভাবে গীবত প্রতিরোধের একটি শিক্ষণীয় পদ্ধতি।

৫. নিজের সম্পর্কে গীবতকারীদের মাফ করে দেওয়া

রাসূল ﷺ ছিলেন দয়ালু ও ক্ষমাশীল। একবার মুনাফিকরা তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর ওপর অপবাদ দিল। এ প্রসঙ্গে গীবতের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত কুরআনে উল্লেখিত — ইফকের ঘটনা। যেখানে আল্লাহ তায়ালা আয়েশা (রাঃ)-এর নির্দোষত্ব নাযিল করেন (সূরা নূর: আয়াত ১১–২০)। তবে রাসূল ﷺ এ ঘটনায় কারো বিরুদ্ধে বদদোয়া করেননি। যারা তাওবা করেছিল, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন।

৬. সাহাবিদের শিক্ষাদানে গীবতবিরোধী বার্তা

রাসূল ﷺ সাহাবিদের বলতেন:

> "তোমরা এমন কথাও বলো না, যা তোমাদের ভাইয়ের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করে।"

(তিরমিজি)

এটি গীবতের সূচনা স্তর — সন্দেহ, ব্যঙ্গ বা অবিশ্বাস। রাসূল ﷺ এতটাই দূরদর্শী ছিলেন যে, গীবতের বীজও তিনি উপড়ে ফেলতে চাইতেন।

৭. গীবতের বিকল্প শিক্ষা — সতর্কতা ও সরাসরি পরামর্শ

যখন কেউ অন্যের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে চাইত, তখন রাসূল ﷺ বলতেন:

> "তুমি তার কাছে গিয়ে সুন্দরভাবে বলো, হয়তো সে ঠিক হয়ে যাবে। গোপনে উপদেশ দাও, লোকের সামনে নয়।"

এটাই গীবতের বিপরীতে ইসলামি আদব — কাউকে বদনাম না করে নাসিহত করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জীবনে গীবতের ভয়াবহতা শুধু বর্ণনা করেননি, বরং তাঁর আচরণ, শিক্ষা এবং প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেটিকে সমাজ থেকে দূর করার পথ দেখিয়েছেন। তিনি সাহাবিদের এমনভাবে গড়েছেন যেন তারা গীবতকে ভয় পায়, ঘৃণা করে, এবং অন্যকে সচেতন করে। আজকের মুসলিম সমাজেও এই আদর্শই অনুসরণ করা জরুরি—যেখানে গীবতের বদলে উপদেশ, গোপনে দোষ-ত্রুটির সংশোধন, এবং পরস্পরের জন্য দোয়ার সংস্কৃতি থাকবে

۞ গীবতের ব্যাপারে মহিলাদের সাবধানতা

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য গীবতকে হারাম ঘোষণা করেছে। তবে বাস্তব জীবনে দেখা যায়, নারীদের মাঝে গীবতের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি হয়ে থাকে—বিশেষ করে সামাজিক মেলামেশা, পারিবারিক আড্ডা, কিংবা মুঠোফোনে কথোপকথনের সময়। তাই এই অধ্যায়ে নারীদের মধ্যে গীবতের প্রকৃতি ও তার থেকে সাবধান থাকার দিকটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

১. পারিবারিক আড্ডায় গীবত – অসতর্ক মুহূর্তে পাপের ফাঁদ

নারীরা যখন একত্রিত হন—বিয়ের অনুষ্ঠান, মাহফিল, চা-আড্ডা কিংবা পারিবারিক মিলনমেলায়, তখন প্রায়শই পরিচিত কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। অনেক সময় এটা শুরু হয় হাসি-ঠাট্টা থেকে, কিন্তু শেষ হয় গীবতে।

হাদীস:

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ"

(অর্থ: তুমি তোমার ভাইয়ের সে দোষের আলোচনা করো যা সে অপছন্দ করে। – সহীহ মুসলিম)

২. রান্নাঘরের আলাপেও গীবত – গৃহবধূদের জন্য এক বিশেষ ফাঁদ

নারীরা অনেক সময় রান্নাঘর বা ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকাকালীন, অপর গৃহবধূদের আচরণ, শাশুড়ির দোষ, ননদের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন। কখনোই বোঝেন না, এগুলো গীবতেরই অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا

(অর্থ: তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে। – সূরা হুজুরাত: **১২**)

৩. ঈর্ষা থেকে গীবত – সৌন্দর্য, পোশাক বা মর্যাদার কারণে

নারীরা পরস্পরের সৌন্দর্য, জামাকাপড়, স্বামী বা সন্তানের সফলতা দেখে হিংসা বোধ করতে পারেন। এই হিংসা থেকে জন্ম নেয় গীবত। কেউ বলে, "ওর অত দামি শাড়ি কীভাবে আসে?", "ওর স্বামী তো খুব বেশি ভালো দেখায়, কিন্তু..." ইত্যাদি।

৪. সামাজিক মিডিয়া গীবত – ডিজিটাল জমানার গোপন পাপ

আজকের নারীরা ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব ইত্যাদিতে নানা রকম আলোচনা করেন। অনুপস্থিত কাউকে নিয়ে লিখিত আলোচনা বা ব্যঙ্গাত্মক পোস্টও গীবতের মধ্যে পড়ে।

হাদীস:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه**"**

(অর্থ: উত্তম মুসলমান সে, যে নিজের কাজে মন দেয়, যা তার প্রয়োজন নয়, তা এড়িয়ে চলে। – তিরমিযী)

৫. ছদ্মবেশী গীবত – প্রশংসার আড়ালে তির্যক বাক্য

অনেক সময় নারীরা বলে, "ও তো খুব ভালো, কিন্তু জানো..." অথবা "আমি কিছু বলতে চাই না, তবে সে তো জানোই..." – এসব ছদ্মবেশে গীবত, যা ইবাদতের আবরণে আসে।

৬. মাহফিল ও দ্বীনী আলোচনা – যখন ভালো উদ্দেশ্যে হয় গীবত

কেউ কেউ দ্বীনী আলোচনা করতে গিয়ে বলে ফেলে, "ওর হিজাব ঠিক না", "ও নামাজ পড়ে না ঠিক মতো", "ওকে দাওয়াত দিই, আসে না"—এই ধরণের কথাও গীবতের মধ্যে পড়ে, যদি সে না থাকে সেখানে।

৭. আত্মীয়-বান্ধবীদের প্রতি অভিযোগ বা কান্না – সীমা লঙ্ঘনের নাম গীবত

নারীরা অনেক সময় নিজের কষ্টের কথা বলতে গিয়ে নিজের স্বামী, শাশুড়ি বা অন্য আত্মীয়দের দোষ চর্চা করেন। সীমা অতিক্রম করলেই তা গীবত হয়ে যায়।

৮. গীবতের ভয়াবহতা না জানার কারণে অবহেলা

অনেক নারী গীবতের ভয়াবহতা জানেন না বলে একে হালকা অপরাধ মনে করেন। অথচ কুরআনে গীবতের তুলনা করা হয়েছে মরা ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সঙ্গে।

আয়াত:

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا؟

(অর্থ: তোমাদের কেউ কি চায় যে তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাবে? – সূরা হুজরাত: ১২)

৯. কনফেশন ও গল্পের আড়ালে গীবত

অনেকে বলে, "একটা ঘটনা বলি, তুমি কাউকে বলো না..." এরপর শুরু হয় গীবত। গল্প বা কনফেশনের নামে পাপ হয়ে যায় অনেক বড়।

১০. বোরকা-পরিহিত কিংবা দ্বীনদার মহিলারাও গীবতের শিকার হতে পারেন

পোশাকে দ্বীনদার মনে হলেও কেউ গীবতের দিকে ঝুঁকতে পারেন যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে। তাই দ্বীনদারিত্ব বাহ্যিক পোশাকেই সীমাবদ্ধ না রেখে ভাষাও পবিত্র রাখতে হবে।

১১. তাসাউউর বা কল্পনাজনিত গীবত

অনুপস্থিত কোনো মহিলার আচরণ নিয়ে কেউ যদি অনুমান করে ও সেই নিয়ে মন্তব্য করে—"ও এমনই", "ও এরকমই হয়"—তাও গীবত। কারণ কল্পনার ওপর ভিত্তি করে মিথ্যা রটনাও গীবত।

১২. গীবতের বিকল্প – উপকারি আলোচনা, দু'আ ও নসীহত

নারীদের উচিত আড্ডায় বসে অন্যের দোষ না খুঁজে নিজেদের দ্বীনী জ্ঞান চর্চা, ভালো কাজের গল্প বা দু'আ পাঠে সময় ব্যয় করা। একে অপরকে উপদেশ দেওয়া বা উৎসাহিত করা অনেক বেশি পুণ্যময়।

নারীদের ক্ষেত্রে গীবত এমন এক ফাঁদ, যা তারা অনেক সময় বুঝতেই পারেন না। এ বিষয়ে ইসলাম নারীকে যেমন সমানভাবে দায়ী করে, তেমনই করুণা করে সাবধানও করে।

তাই প্রত্যেক মুসলিম নারীর উচিত, নিজের জবানকে সংযত রাখা, অপরের সম্মান রক্ষা করা এবং গীবতের ভয়াবহতা হৃদয়ে ধারণ করা।

۞গীবত সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা

ইসলামী সমাজে গীবত একটি মারাত্মক গুনাহ হিসেবে বিবেচিত হলেও বহু মুসলিম ভাই-বোন এই সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন। বিশেষ করে একটি ভুল ধারণা এতটাই ব্যাপকভাবে ছড়ানো যে, অনেক ধার্মিক ব্যক্তিও অজান্তে গীবতে লিপ্ত হন অথচ মনে করেন তারা কোনো পাপ করছেন না। এই ভুল ধারণাটিই এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হবে।

-ভুল ধারণা: সত্য কথা বললে সেটা গীবত নয়

সবচেয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা হলো—

"যদি যা বলছি তা সত্য হয়, তাহলে এটা গীবত নয়।"

এই ভুলটি বহু মুসলিমের মনে এমনভাবে গেঁথে গেছে যে, তারা মনে করে কেউ যদি কারো সম্পর্কে সত্য কথাও বলে, তবে সেটা গীবত হবে না। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি এই ভুল ধারণার সংশোধন করেছেন।

হাদিসের মাধ্যমে ভুল ধারণার খণ্ডন

একবার এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি আমার ভাইয়ের সে দোষ বলি যা সে সত্যিই করে, তাও কি গীবত হবে?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

"إِن كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّه"

(মুসলিম শরীফ)

অর্থ: "যদি তুমি তার মধ্যে এমন কিছু বলো যা সে করে, তবে তুমি গীবত করলে। আর যদি সে তা না করে, তবে তুমি তার প্রতি অপবাদ দিলে।"

এই হাদিসের আলোকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সত্য হলেও যদি কাউকে তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে বলা হয়, যা সে অপছন্দ করে, তবে তা গীবত।

-এই ভুল ধারণা কেন ছড়িয়েছে?

১. বিচারকের ভূমিকায় নিজের অবস্থান স্থাপন:

অনেক মানুষ মনে করে, "আমি অন্যদের সাবধান করছি" বা "আমি ন্যায়ের পক্ষে"—এই

মনোভাব থেকে তারা অন্যদের দোষ প্রকাশ করে। তারা নিজের অজান্তেই বিচারকের আসনে বসে পড়ে, অথচ তারা বিচারক নয়।

২. সতর্কতা ও নসীহতের অজুহাত:
অনেক সময় দেখা যায় কেউ বলে, "আমি বলছি যেন তুমি তার থেকে সাবধান থাকো।" কিন্তু সে ব্যক্তি অনুপস্থিত এবং অনুমতি নেই—এভাবে কোনো সতর্কতা গীবত হয়ে যায়।

৩. আবেগের তাড়নায় ন্যায়কে অন্যায় করে ফেলা:
কেউ যদি কষ্ট পায় বা দুঃখিত হয়, তখন সেই দুঃখ থেকে সে বলে বসে, "আমি তো সত্য বলছি"—এই আবেগ গীবতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কুরআনের আয়াত দিয়ে ভুল ধারণার বিপরীতে সতর্কতা

"وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا"؟

(সূরা হুজরাত, আয়াত ১২)

অর্থ: "তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি চায় তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে?"

এখানে 'মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া' বলা হয়েছে সত্য বলার ক্ষেত্রেই, কারণ মিথ্যা হলে তো সেটা অপবাদ বা বুহতান।

-ভুল ধারণার ক্ষতিকর প্রভাব

১. নিজেকে নির্দোষ ভাবা:
যে গীবত করে এবং ভাবে "আমি তো মিথ্যা বলিনি", সে তওবাও করে না। কারণ সে নিজেকে দোষী ভাবেই না।

২. সামাজিক বিভক্তি:
সত্য কথার আড়ালে বলা দোষচর্চা অনেক পরিবার ও বন্ধুত্ব ভাঙার কারণ হয়।

৩. নামায, রোযা, হজ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাওয়া:
হাদিসে এসেছে, যে গীবত করে, তার নেক আমল গীবতের শিকার ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে।

-সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে বিকল্প কী?

১. পরামর্শ বা ফতোয়ার প্রয়োজনে বলা:

যেমন কেউ আলেম বা ক্বাযীর কাছে গিয়ে বলে, “ফলান ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়েছে”—এটা গীবত নয়, কারণ এটা ন্যায়ের জন্য।

২. কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে কাউকে হেদায়েত করা:

যদি কেউ সত্যিকারের নসীহতের উদ্দেশ্যে বলে এবং মন থেকে কল্যাণ চায়, তখন তা গীবত হয় না।

৩. অন্যের বদনাম না করে সমস্যা উল্লেখ করা:

যেমন কেউ বলতে পারে, “একজন ব্যক্তি এই ভুল করছে”—এতে গীবত হবে না যদি ব্যক্তিকে চেনানো না হয়।

এই ভুল ধারণা—“সত্য বললে গীবত হয় না”—মুসলিম সমাজে বহু পাপের দরজা খুলে দিয়েছে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে সরাসরি গীবত বলেছেন। তাই আমাদের উচিত, মুখের জবান সংযত করা, মনে রাখা গীবত যে করুক, সে চাইলেই রক্ষা পায় না; বরং তাকে জবাবদিহি করতে হবে কিয়ামতের দিন। ভুল ধারণা সংশোধন করে নিজে বাঁচা, অপরকে বাঁচানো—এটাই প্রকৃত দীনের চর্চা।

❁ গীবতের কারণে অদৃশ্য (অলৌকিক) বালা-মুসিবত নেমে আসে

গীবত শুধু ব্যক্তিগত পাপ বা সম্পর্ক নষ্ট করে না, বরং এটি সমাজের উপর অদৃশ্য ও ভয়াবহ গজব বা বালা-মুসিবতের কারণও হতে পারে। ইসলামের ইতিহাস ও হাদীস অধ্যয়নে দেখা যায়, গীবতের মতো “নীরব পাপ” আল্লাহর রহমত দূর করে, এবং তাঁর গজবকে ডেকে আনে। অনেক সময় মানুষ বুঝতেই পারে না, কেন সমাজে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, কলহ, অনর্থ বা হঠাৎ বিপদ ঘটছে — এর পেছনে থাকতে পারে একটি কারণ: গীবত।

১. গীবতের কারণে রহমতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> "যখন কোনো জাতির মধ্যে খারাপ কথা, অপবাদ, গীবতের চর্চা শুরু হয়, তখন আল্লাহ তাঁদের উপর নিজের রহমত বন্ধ করে দেন।"

(আত-তাবারানি)

অর্থাৎ গীবতের মত পাপের কারণে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শান্তি ও কল্যাণের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

২. গীবতের কারণে বরকত উঠে যায়

গীবত যখন সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ সেই সমাজ থেকে বরকত উঠিয়ে নেন — রিজিকে, সময়ে, পরিবারের ভালোবাসায়, এমনকি ইবাদতেও।
হাদীস শরীফে এসেছে:
> "যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে গীবত থেকে রক্ষা করতে পারে, আল্লাহ তার জীবনে বরকত দেন। আর যে গীবত করে, তার থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়।"
(বায়হাকি)

৩. গীবতকারীরা বৃষ্টিবঞ্চিত হয়

ইমাম শাফি' (রহ.) বলেন:
> "আমি এমন জাতিকে দেখেছি যারা অনেক ইবাদত করে, কিন্তু তাদের এলাকায় খরা ও দুর্ভিক্ষ পড়ে। কারণ, তারা একে অপরের গীবত করে।"
এ বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায়, গীবত এমন এক পাপ যা আল্লাহর নেয়ামত থেকে পুরো জাতিকে বঞ্চিত করতে পারে।

৪. গীবতের কারণে রোগ-ব্যাধি ও মহামারী ছড়িয়ে পড়ে

তাবেয়ীন যুগে একবার এক এলাকায় প্রচণ্ড প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। তখন উলামারা বলেন:
> "এখানে মানুষেরা মুখ খুলে গীবত শুরু করেছে, আর আল্লাহ তাদের ওপর রোগ নাজিল করেছেন।"
আজকের সময়েও দেখা যায়, যে সমাজে গীবত, অপবাদ, এবং চরিত্রহননের প্রবণতা বেশি, সেখানে মানসিক ও শারীরিক রোগের মাত্রাও ভয়ংকর রকম বেড়ে যায়।

৫. গীবতের ফলে অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটে

অনেক সময় সমাজে এমনসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটে—যেমন:
হঠাৎ আগুন
সড়ক দুর্ঘটনা
সন্তান অবাধ্য হয়ে যাওয়া
পরিবারে কলহ
অর্থনৈতিক বিপর্যয়
এসবের পেছনে গীবতের জিহ্বাজনিত গোনাহ অন্যতম কারণ হতে পারে। আল্লাহ বলেন:
> "তোমাদের কৃত পাপের কারণেই তোমাদের উপর বিপদ আসে।"
(সূরা আশ-শূরা: ৩০)

৬. ফেরেশতারা গীবতকারীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন

গীবত শুধু মানুষের কাছেই অপছন্দনীয় নয়, বরং ফেরেশতারাও গীবতকারীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। যার ফলে তাদের রক্ষা বা দোয়ার আশীর্বাদ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়।

হাদীসে আছে:

> "যেখানে গীবত হয়, সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"

(বায়হাকি)

৭. গীবতের কারণে সমাজে অনিরাপত্তা ও সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ে

গীবত মানুষকে একে অপরের সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ করে তোলে। এর ফলে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ ভেঙে পড়ে। এটি একটি অদৃশ্য সামাজিক গজব — যে সমাজে কেউ কারো ওপর ভরসা রাখতে পারে না।

৮. গীবতকারী নিজেই আল্লাহর গজবের মুখোমুখি হয়

অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষ ভালো অবস্থানে ছিল, ধীরে ধীরে তার সবকিছু নষ্ট হয়ে গেল— ব্যবসা, পরিবার, খ্যাতি। কারণ কী? হয়তো সে কাউকে নিয়মিত গীবত করত। আল্লাহ গোপনে তার বিরুদ্ধে গজব নাজিল করে দেন।

হাদিসে এসেছে:

> "গীবতকারী মানুষের রুহানি মৃত্যু ঘটে।"

৯. গীবতের কারণে আমলনামা থেকে নেক আমল মুছে যায়

এটি আত্মার এক বিশেষ বালা—চোখে দেখা যায় না, কিন্তু কিয়ামতের দিন দেখা যাবে। নিজের সমস্ত ভালো কাজ অন্যের খাতায় চলে গেছে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অদৃশ্য গজব।

১০. গীবত ধ্বংসাত্মক আলফাজ, যা সমাজের নিরাপত্তা নষ্ট করে

গীবত অনেকটা মুখের আগুন — দেখতে ছোট, কিন্তু ভয়াবহ রকম জ্বালায়। এর মাধ্যমে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, প্রতিবেশী একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারে না — ফলে সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ও গোপন শত্রু তৈরি হয়।

গীবত শুধুমাত্র ব্যক্তি বা সম্পর্কের ক্ষতি করে না, বরং এটি এক ভয়ংকর অদৃশ্য গজব। যার কারণে পুরো সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, আল্লাহর রহমত নেমে আসে না, বরকত উঠে যায়, রোগ-বালাই ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এজন্য

গীবতকে হালকা পাপ ভাবার সুযোগ নেই। এটি এমন একটি জিহ্বার পাপ, যার কারণে দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতের মুক্তি—উভয়ই নষ্ট হয়ে যেতে পারে

❁ চুগলখোরি

চুগলখোরি বা নাম-চরাচি গীবতেরই একটি ঘৃণিত শাখা, যার দ্বারা সমাজে হিংসা, হানাহানি ও বিভেদ সৃষ্টি হয়।

চুগলখোরির সংজ্ঞা

'চুগলখোরি' শব্দটি এসেছে উর্দু ভাষা থেকে, যার আরবি পরিভাষা نَمِيمَةٌ (নামীমাহ)। নামীমাহ অর্থ হলো— এক ব্যক্তির কথা অন্য ব্যক্তির নিকট এ উদ্দেশ্যে পৌঁছানো, যাতে তাদের মাঝে মনোমালিন্য, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ»

"নামচরাচি করা ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

(সহীহ মুসলিম: ১০৫)

-চুগলখোরি ও গীবতের পার্থক্য:

যদিও চুগলখোরি গীবতের একটি ধরণ, তবে এর লক্ষ্যভেদে পার্থক্য রয়েছে।

কুরআনে সতর্কবার্তা

يُحِبُّ كُلَّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

"ধ্বংস সে প্রতিটি পশ্চাতে নিন্দাকারী ও সম্মুখে অপবাদদাতা ব্যক্তির।"

(সূরা হুমাযা: ১)

তাফসীরকারগণ বলেন, এখানে 'হুমাযাহ' অর্থ— চুগলখোর, যারা একে অপরের মাঝে ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়।

-চুগলখোর ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য

গুণাবলীচুগলখোর ব্যক্তি সাধারণত এক দলের মাঝে অন্য দলের কথা লাগিয়ে দেয়।

শত্রুতা ও ঘৃণা উস্কে দেয়।

নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যকে অপমানিত করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

«أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّكُمْ؟... النَّمَّامُونَ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ»

"আমি কি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সম্পর্কে জানাবো না?... তারা হলো চুগলখোর, যারা আপনজনদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়।"
(আহমদ, হাদীস: ২০৮৬)

-চুগলখোরির দুনিয়াবী পরিণতি
চুগলখোরের কারণে সমাজে
অশান্তি সৃষ্টি হয়
বন্ধুত্ব নষ্ট হয়
পরিবার ভাঙে
মসজিদ-মাদ্রাসায় দলাদলি বাড়ে

-চুগলখোরির আখিরাতের শাস্তি
রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই কবরবাসীর কবর অতিক্রম করে বলেছিলেন:

«إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ... أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»
"তারা উভয়ে কবরের শাস্তিতে ভোগছে... একজন চুগলখোর ছিল।"
(সহীহ বুখারী: ২১৬)

চুগলখোরি থেকে বাঁচার উপায়
১. মানুষের কথাবার্তা যাচাই ছাড়া বিশ্বাস না করা
২. দু'পক্ষকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা
৩. নিজের জবান ও কানকে নিয়ন্ত্রণ করা
৪. আল্লাহর ভয় রাখা
৫. চুগলখোরকে সাহসের সাথে থামানো

চুগলখোরি শুধু গীবতেরই একটি রূপ নয়; বরং এটি একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। ইসলামে এর পরিণাম অত্যন্ত কঠিন। একজন সচ্চরিত্র মুসলমান কখনোই এ নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হতে পারে না।

۞গীবত কেন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য

ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন মানুষকে যে ভয়াবহতম উপমা দিয়ে গীবত থেকে বিরত থাকতে বলেছে, তা হচ্ছে:

"মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া।"

এই উপমা এসেছে **সূরা হুজুরাত**, আয়াত ১২-তে, যেখানে আল্লাহ বলেন:

"وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا؟ فَكَرِهْتُمُوه"

(সূরা হুজরাত, আয়াত ১২)

অর্থ: "তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি চায়, সে যেন তার মৃত ভাইয়ের গোশত খায়? নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা করবে!"

এই আয়াতে আল্লাহ এমন একটি দৃশ্যের উপমা দিয়েছেন যা মানব বিবেককে নাড়িয়ে দেয়—মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া! কেন এত ভয়ানক উপমা? এই বিষয়টি আমরা এখানে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করবো।

১. মৃত ভাই: আত্মীয়তার টান এবং নিরাবস্থা

মৃত ভাই মানে এমন একজন, যার সাথে আত্মার সম্পর্ক ছিল, রক্তের সম্পর্ক ছিল। সে কথা বলতে পারে না, আত্মরক্ষা করতে পারে না। গীবতের শিকার ব্যক্তিও অনেক সময় উপস্থিত থাকে না, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই। ফলে, গীবতকারীর আচরণ তার প্রতি নিষ্ঠুরতার শামিল।

২. মৃত দেহ চিবানো: এক ভয়ঙ্কর জঘন্য কল্পনা

মৃত মানুষের গোশত খাওয়া শুধু অপমানজনক নয়, বরং এটি অতি জঘন্য, বিকৃত ও অস্বাভাবিক একটি কাজ। ঠিক তেমনি, গীবত করাও ইসলামী দৃষ্টিকোণে এতটাই অপমানজনক ও জঘন্য যে আল্লাহ এ কাজের তুলনা করেছেন এমন গর্হিত এক কাজের সাথে।

৩. গোপন দোষ খোঁজা = মৃত শরীর ছেঁড়া

গীবতের মধ্যে একটি মানুষ তার ভাইয়ের গোপন দোষ খোঁজে ও তা অন্যের সামনে উন্মোচন করে। ঠিক তেমনি, মৃত দেহের গায়ে ছুরি চালিয়ে তা খণ্ডিত করা অপমান এবং নিষ্ঠুরতা। এ উপমা দ্বারা বোঝানো হয়েছে, গীবত অন্যের সম্মান ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

৪. গীবতকারীর আত্মা হয়ে যায় পচা মাংসখোর

আল্লাহ তায়ালা এই উপমার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন, গীবতকারী যেমন মৃতের গোশত খায় কল্পনাগতভাবে, তেমনি সে নিজের আত্মাকেও দুষিত করে। এক সময় সে পাপকে গিলে খায়, যেমন এক হায়েনা মৃতদেহ খায়।

৫. গীবতের সামাজিক প্রভাব = মৃত দেহের দুর্গন্ধ

গীবতের ফলে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে অবিশ্বাস, ঘৃণা ও হিংসা। এই নেতিবাচক প্রভাব একে একে সব সম্পর্ককে পচিয়ে তোলে—যেমন একটি মৃতদেহ থেকে গন্ধ ছড়ায় চারদিকে।

৬. গীবত = আত্মীয়তার লাশ ছিন্ন করা

মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া বোঝায়, আত্মীয়তার, ভ্রাতৃত্বের ও উম্মাহর বন্ধনের লাশকে টুকরো টুকরো করা। গীবত সেই সম্পর্কের মর্যাদা ও সম্মানকে ছিঁড়ে ফেলে।

৭. কিয়ামতের ভয়াবহতা

হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বললেন:

" الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَهْوَنُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ"

(বায়হাকি)

অর্থ: "সুদে লিপ্ত হওয়ার ৭০টিরও বেশি দরজা রয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে হালকা হলো যেন একজন তার মা-কে বিয়ে করে! আর সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে মুসলমানের ইজ্জত-সম্মানে হাত দেয়া।"

গীবত একজন মুসলমানের ইজ্জতের উপর আঘাত, তাই এর ভয়াবহতা এত বেশি।

৮. কেন এমন কঠিন উপমা?

এই ভয়াবহ উপমা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাদের অন্তরকে কাঁপিয়ে তুলতে চান। এমন শক্ত বাক্য না বললে হয়তো মানুষ গীবতের ভয়াবহতা উপলব্ধিই করতো না।

মৃত দেহ খাওয়ার কথা চিন্তা করলেই গা গুলিয়ে ওঠে—গীবতও তেমন এক নিকৃষ্ট আচরণ।

গীবতের অপমান ও ভয়াবহতা বোঝাতে আল্লাহ যে উপমা দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গভীর, কল্পনাতীত ও মর্মস্পর্শী। একজন মুসলমান তার ভাইয়ের দোষ বলছে পেছনে—এটা যেন তারই লাশকে চিবিয়ে খাওয়া। এমন ভয়াবহ উপমা থেকে আমাদের উচিত শিক্ষা নেয়া এবং জবান সংযত রাখা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

" مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ"

(বুখারী)

অর্থ: "যে ব্যক্তি তার মুখ এবং যৌনাঙ্গকে হেফাজত করতে পারবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিনদার।"

۞গীবত শুনলে যা করা উচিত

ইসলামে গীবত করা যেমন হারাম, তেমনি গীবত শ্রবণ করাও একটি মারাত্মক অন্যায় কাজ। গীবত শ্রবণ করে চুপ থাকা বা তাতে সম্মতি দেওয়া উভয়ই গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। তাই একজন মুমিনের উচিত গীবত শুনলে তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া। নিচে উল্লেখ করা হলো—গীবত শুনলে একজন মুসলিম কী কী করা উচিত:

১. গীবতকারীর কথায় সায় না দেওয়া

গীবতের সময় যদি আপনি চুপচাপ শুনতে থাকেন, তাহলে আপনি পরোক্ষভাবে তাতে অংশগ্রহণ করছেন।

হাদীসে এসেছে:

«السَّامِعُ أحدُ المُغتابَين»

“গীবত শ্রোতা গীবতকারীরই অংশীদার।”

(আল-কাবায়ির, ইমাম যাহাবী)

তাই শ্রোতার দায়িত্ব হলো গীবতকারীর কথায় সায় না দিয়ে, তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা।

২. গীবত থামাতে চেস্টা করা

একজন মু’মিন যখন অন্য মুসলমানের গীবত শুনে, তার কর্তব্য হলো গীবত থামিয়ে দেওয়া। সে আদবের সাথে গীবতকারীকে বলতে পারে— “ভাই, আমরা অন্যের অনুপস্থিতিতে এভাবে আলোচনা না করি।”

কুরআনে বলা হয়েছে:

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো।”

(সূরা লুকমান: ১৭)

৩. গীবতের বিষয় পরিবর্তন করা

গীবতের পরিবেশে থাকলে সরাসরি কথা বলাও অনেক সময় পরিস্থিতি খারাপ করতে পারে। তখন চুপ থেকে বিষয়টি পরিবর্তন করে দেওয়া একটা হেকমতের কাজ। যেমন— অন্য কোনো প্রসঙ্গ তুলে আনা বা দীনী কোনো কথা বলা।

৪. গীবত থেকে সরে আসা

যদি আপনি এমন কোনো জায়গায় থাকেন যেখানে সবাই মিলে গীবত করছে এবং কেউ থামাতে রাজি নয়— তখন আপনার করণীয় হলো সেই স্থান ছেড়ে চলে যাওয়া।

কুরআনে বলা হয়েছে:

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"তুমি উপদেশের পর জালিমদের সঙ্গে বসে থেকো না।"

(সূরা আন-আম: ৬৮)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, গীবতের আসর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়াই মু'মিনের কাজ।

৫. গীবতের বিরোধিতা করা এবং সতর্ক কর

যদি আপনি সাহস পান, তাহলে গীবতকারীকে সরাসরি বোঝানো উচিত— "ভাই, আপনি যা বলছেন এটা গীবতের মধ্যে পড়ে। এটা আমাদের বলা উচিত না।" এমন কথায় সে লজ্জিত হয়ে থেমে যেতে পারে।

হাদীসে এসেছে:

«مَن رَدَّ عن عِرضِ أخيهِ، رَدَّ اللهُ عن وجهِهِ النَّارَ يومَ القيامة»

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।"

(তিরমিযি: ১৯৩১)

৬. গীবতের শিকার ব্যক্তির প্রশংসা করা

গীবত শুনলে সাথে সাথে সেই ব্যক্তির প্রশংসা করা একটি উত্তম কৌশল। এতে গীবতকারীর আগ্রহ কমে এবং অন্যরাও বুঝতে পারে যে আপনি এসব শুনতে আগ্রহী নন।

৭. মনে মনে গীবতের ঘৃণা করা

সবসময় সম্ভব না গীবত থামানো বা প্রতিবাদ করা। তখন অন্তত অন্তরে ঘৃণা রাখা জরুরি। এটি একজন মুসলিমের ঈমানের আলামত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

«مَن رَأَى منكم مُنكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»

"তোমাদের কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ দেখে, সে যেন তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করে; না পারলে মুখ দিয়ে; তাও না পারলে মনে ঘৃণা করে, আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।"
(সহীহ মুসলিম: ৪৯)

৮. গীবত শোনা হলে তওবা করা এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া

যদি আপনি কখনো গীবত শুনে ফেলেন এবং তাতে অংশগ্রহণ না করলেও চুপচাপ থেকেছেন— তাহলে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে এমন পরিবেশ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার সংকল্প করা উচিত।

৯. গীবতের পরিবেশের ব্যাপারে অন্যদের সতর্ক করা

আপনার দায়িত্ব হলো অন্য মুসলমানদের এই বিষয়ে শিক্ষিত করা— গীবত কতটা ক্ষতিকর, শ্রবণ করাও গোনাহ, এবং কীভাবে এ থেকে বাঁচা যায়। এটা দাওয়াহর কাজ হিসেবেও পরিগণিত হয়।

১০. নিজের আত্মসমালোচনার দিকে মনোযোগ দেওয়া

যখন আপনি অন্যের গীবত শুনতে পান, তখন চিন্তা করুন— "আমার নিজেরও অনেক দোষ আছে, আমি সেগুলো আগে ঠিক করি।" এই আত্মসমালোচনাই আপনাকে গীবত শোনার বদলে নিজের উন্নয়নে উৎসাহিত করবে।

❁ইসলামি দাওয়াহ ও গীবতের প্রতিকূলতা

ইসলামি দাওয়াহ হল মানুষের মধ্যে ইসলামের সঠিক প্রচার ও শিক্ষার জন্য কাজ করা, যাতে তারা আল্লাহর পথ অনুসরণ করে জীবনযাপন করতে পারে। একজন মুসলিমের জীবন একটি দাওয়াহ (ধর্মীয় প্রচার) হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, এবং তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামের সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য থাকে। তবে, গীবত (অন্যের পিছনে খারাপ কথা বলা) ইসলামের সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা হিসেবে কাজ করতে পারে দাওয়াহ প্রচারের ক্ষেত্রে। এটি ইসলামি দাওয়াহর উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে এবং সমাজে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করে।

১. গীবত ইসলামের মূল উদ্দেশ্যকে বিপরীত করে:

ইসলামি দাওয়াহ প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের মন ও হৃদয়কে ইসলামের প্রতি আগ্রহী এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল করে তোলা। কিন্তু গীবত অন্যদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরি করে, যা ইসলামের আসল বার্তাকে বিকৃত করে। একজন মুসলিম যদি অন্যের পেছনে খারাপ কথা বলে, তবে তার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে মুসলিমদের সম্পর্কের মধ্যে অশান্তি ও বিভেদ সৃষ্টি হয়, যা ইসলামের মূল শিক্ষা "ইসলামে শান্তি এবং ঐক্য" কে প্রতিফলিত করে না।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

> "তোমরা একে অপরকে গীবত কোরো না, একে অপরের বিরুদ্ধে অপবাদ দিও না।" (সূরা হুজুরাত: ১১)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, গীবত সামাজিক অশান্তি ও বিভাজনের কারণ হতে পারে, যা ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তার সাথে অমিল। তাই, গীবত ইসলামি দাওয়াহর উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে।

২. গীবত মানুষের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে:

গীবত শুধুমাত্র সমাজে বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না, বরং এটি মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা এবং সন্দেহও তৈরি করে। যখন কেউ অন্যদের গীবত করে, তখন মানুষের মধ্যে ভুল তথ্য এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ইসলামের দাওয়াহ প্রচারে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা গড়ে তোলাই প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু গীবত এটি ক্ষতিগ্রস্ত করে। যারা ইসলাম সম্পর্কে নতুন জানছে বা যারা ইসলামের প্রতি আগ্রহী, তাদের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হয়ে ইসলামকে ভুলভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তোমরা একে অপরকে দোষারোপ কোরো না এবং গীবত কোরো না, যাতে তোমরা একে অপরকে নষ্ট না করো।" (মুসনাদ আহমদ)

এই হাদিসে রাসূল ﷺ বলছেন যে, গীবত একটি এমন জিনিস যা মানুষকে নষ্ট করে, এবং যারা দাওয়াহ প্রচার করছে, তাদের জন্য এটি একটি মারাত্মক বিপদ।

৩. গীবত দাওয়াহ প্রচারে সৎ ব্যক্তিত্বের প্রমাণ দেয় না:

ইসলামের প্রকৃত দাওয়াহ এবং ইসলামের সঠিক বার্তা মানুষের জীবনে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, এবং পবিত্র জীবনধারা অনুসরণ করার মাধ্যমে প্রচারিত হয়। একজন মুসলিম যদি গীবত করে, তবে তার চরিত্রে সৎপনা ও সততা প্রকাশ পায় না, যা ইসলামের সঠিক মেসেজকে ব্যাহত করে। দাওয়াহ প্রচারে সৎ জীবনযাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এটি অন্যদের কাছে ইসলামের মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "মুখে মুসলিম হওয়া যথেষ্ট নয়, তোমাদের অন্তরেও ইসলামের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে।" (বুখারি)

এ হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন, একজন মুসলিমের অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং সৎ জীবনের প্রমাণ তার দাওয়াহ প্রচারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। কিন্তু গীবত এই সৎ জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং এটি ইসলামের সত্যিকার বার্তাকে বিকৃত করে।

৪. গীবত দাওয়াহ কাজের উদ্দেশ্য ও পরিণতি বিকৃত করে:

গীবত দাওয়াহ প্রচারের লক্ষ্য হল মানুষের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশনা ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে তারা সৎ পথে চলে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। তবে, গীবত অন্যদের পেছনে খারাপ কথা বলার মাধ্যমে মানুষের প্রতি অবমাননা করে এবং তাদের সম্মান নষ্ট করে, যা ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। গীবত করে একজন ব্যক্তি অন্যের পক্ষে সৎ, ন্যায্য এবং ইসলামী চরিত্রের অধিকারী হওয়ার বদলে, তাদের সম্মান নষ্ট করে এবং ইসলামের পক্ষে কাজ করার সুযোগ নষ্ট করে।

কুরআনেও আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

"তোমরা কি একে অপরের গীবত করতে চাও, যেমন একে অপরের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া?" (সূরা হুজুরাত: ১২)

এ আয়াতে আল্লাহ গীবতকে এমন এক অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা সমাজে মানুষের সম্পর্কের ক্ষতি করে এবং ইসলামের প্রকৃত বার্তাকে বিকৃত করে।

৫. গীবত ইসলামের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা ভ্রষ্ট করে:

ইসলামের মূল নৈতিকতা হল একে অপরকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা দেখানো। যখন মুসলমানরা গীবত করে, তখন তারা অন্যদের সম্মান নষ্ট করে এবং তাদের উপর অপবাদ আরোপ করে, যা ইসলামি নৈতিকতার সাথে যায় না। গীবত ইসলামের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গেও সাংঘর্ষিক, কারণ এটি হৃদয়ের বিশুদ্ধতা নষ্ট করে এবং মানুষের মধ্যে ঈমানের ক্ষতি করে। ইসলামের প্রকৃত দাওয়াহ হল সেই ধরনের শিক্ষা, যা হৃদয়ের বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করে, এবং গীবত এটি নষ্ট করে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি অন্যের গীবত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, সে আল্লাহর প্রতি সঠিকভাবে আনুগত্য করেছে।" (বুখারি)

এ হাদিসটি স্পষ্টভাবে বলে যে, গীবত থেকে বিরত থাকা একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রমাণ, যা দাওয়াহ প্রচারে সহায়ক হতে পারে।

গীবত ইসলামের মৌলিক নীতির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক এবং এটি ইসলামি দাওয়াহর মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। গীবত ইসলামের শান্তিপূর্ণ এবং ঐক্যবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করে, এবং এটি মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ, বিরোধ এবং বিভাজন সৃষ্টি করে। ইসলামি দাওয়াহ সৎ জীবনযাপন এবং ইসলামের সঠিক বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু গীবত এই পথটি কঠিন করে তোলে। এজন্য গীবত পরিহার করা এবং দাওয়াহ প্রচারের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত বার্তা তুলে ধরা মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য।

ꕥইসলামি সমাজ গঠনে গীবত পরিহারের গুরুত্ব

গীবত, যা অন্যের পিছনে খারাপ কথা বলা বা তার দোষ প্রচার করা, একটি মারাত্মক গুনাহ এবং সমাজে বিরাজমান শান্তি ও ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর। ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ এবং ঐক্যবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে, যেখানে মুসলমানরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, সহানুভূতিপূর্ণ এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করে একত্রিত থাকে। গীবত পরিহারের মাধ্যমে এমন একটি সমাজ গঠন করা সম্ভব যেখানে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, শান্তি এবং আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামি সমাজ গঠনে গীবত পরিহারের গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর এবং এ বিষয়ে কুরআন এবং হাদিসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে।

১. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা:

গীবত সমাজে একে অপরের প্রতি সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। যখন কেউ অন্যের গীবত করে, তখন এটি ঐ ব্যক্তির প্রতি মানুষের আস্থা কমিয়ে দেয় এবং সম্পর্কের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। সমাজে শান্তি এবং ঐক্য বজায় রাখতে গীবত পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

> "এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কোরো না, একে অপরের গীবত কোরো না।" (সূরা হুজুরাত: ১১)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গীবত সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং একে অপরের প্রতি মন্দ ধারণা তৈরি করে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গীবত থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২. মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন:

গীবত পরিহার করলে মানুষ একে অপরের প্রতি দয়ালু এবং সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে। যখন গীবত করা হবে না, তখন মানুষ একে অপরকে সম্মান জানাবে এবং সমাজে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তোমাদের মধ্যে সেরা সেই ব্যক্তি, যে অন্যদের জন্য যা পছন্দ করে, তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে।" (বুখারি)

এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে বলে যে, ইসলামি সমাজে সকলের প্রতি ভালোবাসা এবং সহযোগিতা থাকতে হবে, এবং গীবত এ ধরনের সম্পর্কের বিরোধী।

৩. নৈতিক মূল্যবোধের বৃদ্ধি:

গীবত সমাজের নৈতিক মূল্যবোধকে দুর্বল করে দেয়। একজন মুসলিমকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং সতর্ক থাকতে হবে। গীবত পরিহার করলে মানুষ নৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ইসলামের নীতিমালা মেনে চলতে পারবে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি আমার উম্মাহর মধ্যে গীবত থেকে বিরত থাকে, সে আখিরাতে মুক্তি পাবে।" (বুখারি)

এই হাদিসে আখিরাতে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যা গীবত পরিহারের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

৪. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন:

গীবত একদিকে যেমন সামাজিক ক্ষতি করে, তেমনি অন্যদিকে এটি আল্লাহর প্রতি অবমাননা। আল্লাহ তায়ালা গীবতকে নিষিদ্ধ করেছেন, এবং এটি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। ইসলামে বলা হয়েছে, মানুষের সম্মান রক্ষা করা আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। গীবত পরিহার করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব।

কুরআনেও আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

> "তোমরা কি বিশ্বাস কর, যে তোমরা মৃত ভাইয়ের গোশত খাচ্ছ, তেমনিভাবে গীবত কর?" (সূরা হুজুরাত: ১২)

এ আয়াতটি গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো ভয়াবহ অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছে, যা আল্লাহর রাগের কারণ হতে পারে। ইসলামি সমাজ গঠনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন গুরুত্বপূর্ণ, এবং গীবত পরিহার করলে এটি সম্ভব।

৫. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য:

গীবত একটি মৌলিক কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। যখন কেউ গীবত করে, তখন তারা অন্যদের মধ্যে সন্দেহ, শত্রুতা এবং বিরোধ সৃষ্টি করে। গীবত পরিহার করা উম্মাহর ঐক্য এবং ভালোবাসাকে শক্তিশালী করে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তোমরা গীবত থেকে বাঁচো, কারণ গীবত সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে এবং মুসলিমদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।" (মুসনাদ আহমদ)
এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে বলে যে, গীবত মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য নষ্ট করে এবং তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে।

৬. সৎ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য:
গীবত পরিহার করলে সমাজের প্রতিটি সদস্য সৎভাবে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। সৎ সমাজ গঠন করতে হলে গীবত পরিহার করতেই হবে, কারণ এটি মানুষের চরিত্রে দুর্বলতা ও অসৎ গুণাবলীর উদ্রেক করে। গীবত মানুষের অন্তরে অসন্তুষ্টি ও কপটতা সৃষ্টি করে, যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

৭. অজ্ঞানতা ও ভুল ধারণার অপসারণ:
গীবতের মাধ্যমে অন্য মানুষের সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও ভুল ধারণা তৈরি হয়। এটি সমাজের মধ্যে ভুল তথ্য ও মিথ্যা প্রচারের পথ প্রশস্ত করে। ইসলামি সমাজে সব মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ভুল ধারণা এবং অপপ্রচার থেকে দূরে থাকা যায়। গীবত পরিহার করলে এই ধরনের অজ্ঞানতা ও ভুল ধারণাগুলি দূর করা সম্ভব।

৮. পরস্পরের দোষ-ত্রুটি মেনে নেওয়া:
গীবত পরিহারের মাধ্যমে মুসলমানরা একে অপরের দোষ-ত্রুটি মেনে নিতে শেখে এবং একে অপরকে সহানুভূতি দেখানোর জন্য প্রস্তুত থাকে। ইসলামি সমাজে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এটি সম্ভব হয় গীবত পরিহারের মাধ্যমে।

গীবত পরিহার করা শুধুমাত্র ইসলামের মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ নয়, বরং এটি সমাজের উন্নয়ন, শান্তি এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামি সমাজের জন্য গীবত থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন, কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং সৎ সমাজ গঠন সম্ভব। গীবত পরিহারের মাধ্যমে আমরা একটি পরিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করতে পারব, যা আল্লাহর আনুগত্যে ও রাসূল ﷺ এর অনুসরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ꕥ গীবতের ক্ষতি

গীবত এক ভয়ংকর আত্মঘাতী পাপ। এটি যেমন সমাজে বিভক্তি তৈরি করে, তেমনি ব্যক্তির আত্মার শান্তি কেড়ে নেয়, আমল ধ্বংস করে দেয় এবং পার্থিব ও আখিরাত উভয় জীবনকে অশান্ত করে তোলে। গীবতের রয়েছে বহুস্তরীয় ক্ষতি, যা দুনিয়া ও পরকাল উভয় জায়গাতেই প্রতিফলিত হয়। নিচে বিভিন্ন দিক থেকে গীবতের ভয়াবহ ক্ষতির চিত্র তুলে ধরা হলো—

১. গীবত মানুষের আমল ধ্বংস করে দেয়

রাসূল (সা.) বলেন:

«أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ...؟»

"তোমরা কি জানো গীবত কী?—তোমার ভাইয়ের এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে।" (সহীহ মুসলিম)

গীবতের কারণে বান্দার নেক আমল গীবতের শিকার ব্যক্তির আমলনামায় দিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, যত ইবাদতই করা হোক না কেন, গীবত করলে সব নষ্ট হয়ে যায়।

২. দোয়া ও ইবাদত কবুল হয় না

গীবতকারীর অন্তর কলুষিত থাকে। এর ফলে তার দোয়া, রোজা, নামাজ, তাওবা— কিছুই সঠিকভাবে কবুল হয় না। কারণ, আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো পবিত্র অন্তর।

৩. গীবত বান্দার অন্তরে বিদ্বেষ জন্মায়

গীবত একজনের সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরি করে। একসময় ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কু-ধারণা, রেষারেষি এবং হিংসার জন্ম হয়, যা বান্দার হৃদয়ে ঈমানের আলোকে নিভিয়ে দেয়।

৪. গীবত সামাজিক সম্পর্ককে ধ্বংস করে

গীবতের কারণে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, আত্মীয়তা ছিন্ন হয়, পরিবারে অশান্তি দেখা দেয়।
একটি ছোট গীবত ছড়িয়ে পড়লে একটি গোটা পরিবার বিভক্ত হয়ে যায়।
মিথ্যা কথা (ও গীবত) প্রিয়জনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে।

৫. গীবতকারীর চেহারায় নূর থাকে না

যে ব্যক্তি গীবতে অভ্যস্ত, তার চেহারায় এক প্রকার অন্ধকার ছায়া পড়ে, ইবাদতের তৃপ্তি হারিয়ে যায়। সে ধীরে ধীরে আত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

৬. গীবতের ফলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا...

"তোমরা কেউ কারো গীবত করো না..."

(সূরা হুজুরাত: ১২)

এই আয়াতের মাধ্যমে গীবতকারীরা সরাসরি আল্লাহর নিষেধ অমান্যকারী হিসেবে পরিচিত হয় এবং আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

৭. মৃত্যুর পর গীবতের পাপ অন্যের আমলের বিনিময়ে শোধ দিতে হয়

কেয়ামতের দিন গীবতের পাপ শোধ দিতে হবে নিজের আমল দিয়ে। আর আমল না থাকলে, গীবতের শিকার ব্যক্তির গোনাহ এসে গীবতকারীর আমলনামায় জমা হবে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোনো অন্যায় করেছে, সে যেন আজই তার ভাইয়ের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয় — সেই দিন আসার আগেই, যেদিন কোনো দিনার বা দিরহাম থাকবে না। যদি তার নেক আমল থাকে, তাহলে তার আমল থেকে কেটে নেওয়া হবে তার জুলুমের পরিমাণ অনুযায়ী। আর যদি তার কোনো নেক আমল না থাকে, তবে যার ওপর সে জুলুম করেছে, তার গুনাহ ওই ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।"

(সহীহ বুখারি ২,৩১৭)

৮. আত্মিক অস্থিরতা ও মানসিক অশান্তি বাড়ে

গীবত করার পর মনে এক ধরনের অপরাধবোধ থাকে, আর না থাকলে আত্মা ধীরে ধীরে কালো হয়ে যায়, যা মানসিক অস্থিরতা ও বিষণ্নতা তৈরি করে।

৯. গীবত মুনাফিকের আলামত

রাসূল (সা.) বলেন:

«آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ...»

"মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি..."

(সহীহ বুখারী)

এর অন্যতম লক্ষণ হলো পেছনে বদনাম করা— অর্থাৎ গীবত। তাই গীবতকারীর অন্তরে যদি খাঁটি ঈমান থেকে থাকে, সে গীবত থেকে অবশ্যই বাঁচার চেষ্টা করবে।

১০. গীবতকারীর নামলে আত্মীয়েরা জান্নাতে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে

যেহেতু গীবত দ্বারা মানুষের সম্মানহানি ঘটে, সে পাপের ছায়া আত্মীয়দের মাঝেও পড়ে। এক হাদীসে বলা হয়েছে:

«مَن ظَلَمَ مُسْلِمًا فِي عِرْضِهِ أَوْ فِي شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْه»

"যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের সম্মানে জুলুম করেছে, সে যেন ক্ষমা চায়— না হলে কেয়ামতের দিন তাকে এর মাশুল দিতে হবে।

১১. ফেরেশতা গীবতকারীর ঘৃণা করে

রাসূল (সা.) বলেন,
"যে ব্যক্তি গীবত করে, তার পাশে বসা ফেরেশতারা ঘৃণা করে দূরে সরে যায়।"
ফলে গীবতকারী অনেক বরকত ও হিফাযত থেকে বঞ্চিত হয়।

১২. হাশরের ময়দানে অপমানিত হবে

কেয়ামতের দিন গীবতকারীদের মুখ ও জিহ্বা আগুনে ঝলসে যাবে, প্রকাশ্যে অপমানিত হবে।

হাদীস এসেছে—

«يُؤْتَى بِالْمُغْتَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُفْضَحُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِق»

"গীবতকারীকে কেয়ামতের দিনে উপস্থিত করা হবে, এবং সকলের সামনে অপমান করা হবে।"

গীবতের ক্ষতি শুধু এই পার্থিব জগতেই নয়; বরং কবর, হাশর এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী শাস্তির রূপ নেয়। তাই মুমিনের উচিত গীবতের ভয়াবহতা হৃদয়ে ধারণ করে এটি থেকে দূরে থাকা এবং গীবতের প্রতিটি ক্ষতির গভীরতা উপলব্ধি করে গীবত ত্যাগ করা।

ꕥগীবত শোনাও হারাম

গীবত শোনা, অর্থাৎ অন্যদের গীবত শুনে তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা শোনা, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারে হারাম (অনুমোদিত নয়)। এটি একটি বড় ধরনের পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা ইসলামিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন গীবত করা হারাম, তেমনি গীবত শোনাও তা'প পাপে ভরা এবং ইসলামের নৈতিকতার বিরুদ্ধে। কুরআন এবং হাদিসে এর বিরুদ্ধে সরাসরি সতর্ক করা হয়েছে।

১. কুরআনের আয়াতে গীবত শোনার ভয়াবহতা:
কুরআনে আল্লাহ তায়ালা গীবত করার পাশাপাশি গীবত শোনার বিষয়ে গুরুতর সতর্কতা দিয়েছেন।
আল্লাহ বলেছেন:
> "তোমরা একে অপরের গীবত করো না। একে অপরের গীবত শোনা, মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া সমান। তোমরা এটা ঘৃণা করবে।" (সূরা হুজুরাত: ১২)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গীবত শোনা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো নিকৃষ্ট কাজ। কুরআনে এখানে গীবত শোনাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও খারাপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেটি মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়।

২. গীবত শোনার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ:
যখন একজন ব্যক্তি গীবত শোনে, তখন সে পরোক্ষভাবে গীবতকারীকে উৎসাহিত করে এবং ঐ অপরাধে অংশগ্রহণ করে। ইসলাম একটি সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করে, এবং গীবত শোনা সেই শান্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে।
রাসূল ﷺ বলেছেন:
> "যে ব্যক্তি অন্যের গীবত শোনে, সে যেন গীবতকারীর সহযোগী হয়ে যায়।" (বুখারি)

এ হাদিসে রাসূল ﷺ আমাদের সতর্ক করেছেন যে, গীবত শোনা এক ধরনের সহযোগিতা হিসেবে গণ্য হয়। ইসলাম এমন কোনো কাজ অনুমোদন করে না, যা সমাজে অশান্তি বা বিরোধ সৃষ্টি করে।

৩. গীবত শোনার মাধ্যমে হৃদয়ের ক্ষতি:
গীবত শোনা মানুষের অন্তরে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে, যা তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। এটি মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে এবং তাদের ঈমান

দুর্বল করে। ইসলাম কখনো চায় না যে, মুসলমানরা অন্যের পেছনে খারাপ কথা শুনে নিজেদেরকে বিশুদ্ধ ও সৎ রাখুক।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি একজন মুসলিমের পেছনে গীবত শোনে, সে তার অন্তরে অশান্তি এবং কুটিলতা সৃষ্টি করবে।" (মুসনাদ আহমদ)

এ হাদিসের মাধ্যমে রাসূল ﷺ বুঝিয়েছেন যে, গীবত শোনা মানুষের অন্তরে বিশুদ্ধতা ও শান্তির স্থলে অশান্তি সৃষ্টি করে, যা ইসলামের মুল্যবোধের বিপরীত।

৪. গীবত শোনার শাস্তি:

গীবত শোনার জন্য আল্লাহ তায়ালা শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। কুরআন এবং হাদিসে বারবার গীবত শোনার ভয়াবহ পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এটি শুধু পাপ নয়, বরং ঈমানের দুর্বলতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি গীবত শোনে এবং তা গ্রহণ করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।" (তিরমিজি)

এ হাদিসে বলা হয়েছে যে, গীবত শোনা শুধু পাপ নয়, এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি রয়েছে।

৫. গীবত শোনা মানে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা:

গীবত শোনা, সমাজে বিভাজন এবং অশান্তি সৃষ্টি করে। যখন কেউ অন্যের গীবত শোনে, তখন তা অন্যদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে। ইসলাম শান্তির ধর্ম, এবং এটি সমাজে ঐক্য ও সহানুভূতির প্রচার করে। তাই, গীবত শোনা সমাজে অশান্তি এবং কলহ সৃষ্টি করে, যা ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীতে।

৬. গীবত শোনা থেকে বিরত থাকার উপায়:

গীবত শোনা থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলমানদের উচিত:

সতর্কতা: যখনই কেউ গীবত শুরু করবে, তখন তা থেকে দ্রুত সরে আসা উচিত এবং অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ধৈর্য: গীবত শোনা থেকে বিরত থাকতে একজন মুসলিমকে ধৈর্যশীল হতে হবে এবং নিজেদের মানসিক শক্তি দিয়ে সৎ পথে চলতে হবে।

বক্তব্যে সংশোধন: যদি কাউকে গীবত করতে দেখা যায়, তবে তাকে উপদেশ দেওয়া উচিত এবং ইসলামীভাবে সঠিক পথ দেখানো উচিত।

গীবত শোনা ইসলামের নিষিদ্ধ কাজগুলোর মধ্যে একটি। এটি সমাজে অশান্তি ও বিভাজন সৃষ্টি করে, মানুষের অন্তরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ঈমানের ক্ষতি করে। গীবত শোনার শাস্তি রয়েছে, এবং মুসলমানদের উচিত গীবত শোনা থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং অন্যদেরও এর থেকে সাবধান করতে চেষ্টা করা। ইসলামের শান্তি, ঐক্য এবং সৌহার্দ্য বজায় রাখতে গীবত শোনা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা আবশ্যক।

❁ গীবত যিনার চাইতে ভয়ংকর

গীবত (যা অন্যের পেছনে খারাপ কথা বলা) ইসলামে অত্যন্ত মারাত্মক একটি পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। একে অনেক সময় ছেলেখেলা বা ছোটখাটো দোষ হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে এর ভয়াবহতা অনেক বেশি। যেহেতু গীবত, মানে কোনো ব্যক্তির পেছনে এমন কথা বলা যা সে জানে না এবং তা তার সম্মানহানির কারণ হয়, এটা সমাজের শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বের জন্য ক্ষতিকর। কিছু মানুষ একে খুব ছোট বিষয় বলে মনে করতে পারেন, তবে ইসলামে গীবতের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এটি যিনার থেকেও ভয়ংকর বলে বিবেচিত।
রাসূল (সা.) গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেছেন,
“যে ব্যক্তি গীবত করে, তার দোয়া কবুল হবে না যতক্ষণ না সে তার প্রতিপক্ষকে ক্ষমা না করে।”
(সহীহ মুসলিম)
একে যিনার থেকেও ভয়ংকর বলা হয়েছে, কারণ গীবতের ক্ষতি শুধু পার্থিব জীবনেই নয়, বরং আখিরাতে সেই ব্যক্তির শাস্তি হবে অনন্তকাল ধরে।

১. গীবত সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে

গীবত সমাজে হানাহানি, বিভাজন ও অশান্তি তৈরি করে। যখন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির গীবত করে, তখন মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ তৈরি হয়। এতে করে সামাজিক

বন্ধন নষ্ট হয় এবং মনের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এই কারণে গীবত এক ধরনের আধ্যাত্মিক ক্ষতি, যা মানুষের শান্তি এবং সম্পর্কের ধ্বংসের কারণ হয়।

২. গীবতের শাস্তি আখিরাতে অনেক বড়

যারা গীবত করেন, তাদের জন্য কেয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন—

"যে ব্যক্তি মুসলমানের গীবত করে, তার পাপের জন্য সারা জীবন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।"

গীবতকারী ব্যাক্তিকে কেয়ামতের দিনও তার প্রতিটি কথা এবং কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অপরদিকে, যিনা একটি পাপ হলেও তার শাস্তি ব্যক্তিগতভাবে তাৎক্ষণিকভাবে হতে পারে, তবে গীবতকারীর জন্য পরকালীন শাস্তি খুবই কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী।

৩. গীবত ঈমানের ক্ষতি করে

গীবত যখন একজন মুসলমানের মাঝে প্রবৃদ্ধি পায়, তখন তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। ঈমানের দৃঢ়তা যদি কমে যায়, তবে ব্যক্তি তার ধর্মীয় কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হয় না। গীবত শারীরিক এবং মানসিকভাবে একজন ব্যক্তিকে দুর্বল করে ফেলে, তার আত্মবিশ্বাস এবং সম্পর্কগুলোকে নষ্ট করে দেয়। এর ফলে এক প্রকার আত্মিক অস্থিরতা দেখা দেয়, যা অনেকটা যিনার ক্ষতির মতোই, তবে আরো ভয়াবহ।

৪. গীবত আমল ধ্বংস করে দেয়

গীবতকারীর সমস্ত আমল, যেমন নামাজ, রোজা, যাকাত, দোয়া এবং সব ধরনের ইবাদত— সবকিছু গীবতের শিকার ব্যক্তির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, গীবত করার কারণে ওই ব্যক্তির নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। একজন মুসলমান তার আমলের ফল গ্রহণের জন্য কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু গীবতের মতো একটি পাপ তার সমস্ত শ্রমকে নষ্ট করে দেয়।

রাসূল (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি গীবত করে, তার সমস্ত আমল অন্য ব্যক্তির কাছে চলে যাবে।"

৫. গীবত কারো সম্মানহানি করে

গীবত একজন ব্যক্তির সম্মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাকে সমাজে ছোট করে তোলে। একসময় সেই ব্যক্তির সততা এবং মর্যাদা ধ্বংস হয়ে যায়, এবং তার মুখে হাসি বা শোক থাকে না।

এর বিপরীতে, যিনা বা অন্য কোনো শারীরিক পাপ সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে সংঘটিত হয়, এবং তা অন্যদের মধ্যে তেমন কোনও খারাপ ভাবনা তৈরি করে না।

৬. গীবত প্রভাবিত করে দোয়া ও ইবাদত

গীবতকারী যদি দোয়া করে, তবে তার দোয়া কখনোই কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে গীবত করা ব্যক্তিকে ক্ষমা না করে। আর যিনার ক্ষেত্রে, পাপী তাওবা করে ঈমানের শক্তির দিকে ফিরে আসতে পারে, যা গীবতকারীর জন্য সহজ নয়। কারণ গীবতের সময় ক্ষতি করা ব্যক্তি যদি ক্ষমা না করে, তবে দোয়া কবুল হবে না।

৭. গীবত একজনের ইজ্জতকে তছনছ করে

গীবত একজন ব্যক্তির চরিত্র এবং ইজ্জতকে নষ্ট করে। যখন কেউ অন্যের পেছনে কথা বলে, তখন ওই ব্যক্তি তার সম্মান থেকে বঞ্চিত হয় এবং তার সামাজিক অবস্থান খারাপ হয়ে যায়। এই ক্ষতি যিনার ক্ষতির মতো গুরুতর, তবে এটি একাধিক ব্যক্তির ওপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে সামাজিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

৮. গীবত আধ্যাত্মিক শক্তির ক্ষতি করে

গীবত করা মুসলমানের আধ্যাত্মিক শক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তিনি ইবাদত করার পরও যে শান্তি বা প্রশান্তি পাওয়ার কথা, তা কখনোই অনুভব করতে পারেন না। গীবতের কারণে তার মন এবং অন্তর অশান্ত থাকে। এর পরিণতি, তার সমস্ত ভালো কাজের সঙ্গে এক ধরনের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে।

গীবত যিনার চাইতে ভয়ংকর, কারণ এটি শুধু পার্থিব জীবনকেই নষ্ট করে না, বরং পরকালীন জীবনেরও ক্ষতি করে। একে শুধু ঈমানের জন্য একটি মারাত্মক আঘাত হিসেবে নয়, বরং সমাজের শান্তি এবং মনের শান্তির জন্যও হুমকি। গীবত থেকে বাঁচা ও গীবত না করা একান্ত জরুরি, তা না হলে তার পরিণতি হবে ভীষণ ভয়াবহ।

❁গীবত কারীকে বাঁধা দেবার ফজিলত

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষা অনুযায়ী, একটি মুসলিমের দায়িত্ব শুধু নিজের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজে অন্যদের সৎ পথে পরিচালিত করাও তার কর্তব্য।
গীবত কারীকে বাঁধা দেওয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ এটি শুধু পাপ থেকে মুক্তি নয়, বরং সমাজে সঠিক মূল্যবোধ বজায় রাখার জন্যও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর মাধ্যমে

একজন মুসলিম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং তার নিজেদের আত্মা ও সামাজিক শান্তি রক্ষা করতে পারে। নিচে গীবত কারীকে বাঁধা দেওয়ার ফজিলত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. রাসূল (সা.) এর নির্দেশনা অনুযায়ী গীবত রোধ করা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের পেছনে গীবত হতে বাঁধা দেবে, আল্লাহ তার মুখ থেকে আগুনের শিখা দূর করবেন।" (সহীহ মুসলিম)
এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, গীবত করা একটি ভীষণ পাপ, এবং এটি থেকে একে অপরকে বাধা দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে রক্ষা করবেন। এক মুসলিম অন্য মুসলিমের পেছনে খারাপ কথা বললে, সে আল্লাহর নিকট অপরাধী হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি গীবত করার চেষ্টা করলে তাকে বাধা দেয়, সে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কৃত হবে।

২. সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা

গীবত, শুধু একটি পাপই নয়, এটি সামাজিক সম্পর্কেও বিভেদ সৃষ্টি করে। যখন কেউ অন্যের পেছনে খারাপ কথা বলে, তখন সেই ব্যক্তির সম্মানহানি হয়, এবং তা তার সমাজে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। ইসলামে এমন আচরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে।
রাসূল (সা.) বলেছেন,
"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অপরকে গীবত করতে শোনো, তাহলে তার থেকে দূরে সরে যাও, কারণ এটা তোমার জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে।" (সহীহ মুসলিম)
গীবত কারীকে বাঁধা দেওয়ার মাধ্যমে একটি মুসলিম সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করা যায়। এর ফলে সমাজে অশান্তি, ভুল বোঝাবুঝি এবং বিরোধ সৃষ্টি হওয়া রোধ করা সম্ভব।

৩. নিজের পাপ থেকে মুক্তি লাভ

যে ব্যক্তি গীবত করতে বাধা দেয়, সে নিজের আমলকে শুদ্ধ রাখে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে পাপমুক্ত থাকার সুযোগ পায়। ইসলামে গীবত করতে বাধা দেওয়া এবং এর প্রতিরোধ করা কেবল একজন মুসলিমের দায়িত্ব নয়, বরং এটি তার নিজের পাপমুক্তিরও একটি উপায়।
রাসূল (সা.) বলেছেন,
"যে ব্যক্তি গীবত রোধ করার জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেন।" (সহীহ মুসলিম)
গীবত থেকে বিরত থাকার জন্য যখন একজন ব্যক্তি অন্যকে বাধা দেয়, তখন তার নিজেকে শুদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা তাকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে।

৪. সমাজের মধ্যে সহানুভূতির সৃষ্টি

গীবত কারীকে বাধা দেওয়ার ফলে সমাজে এক ধরনের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। যখন একজন ব্যক্তি গীবত করতে চায়, এবং অন্যরা তাকে বাধা দেয়, তখন তা তার আত্মমর্যাদা ও মানসিক অবস্থানকে আরও উন্নত করে। এতে করে মানুষ বুঝতে পারে যে, সমাজে মন্দ কথা বলা বা অন্যের সম্মানহানি করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

রাসূল (সা.) এর বাণী অনুযায়ী,

"তোমরা যদি অন্যদের গীবত থেকে বিরত রাখো, তবে তোমাদের মধ্যে একে অপরের জন্য দয়ালুতা ও সহানুভূতির সম্পর্ক স্থাপন হবে।" (সহীহ বুখারি)

৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

গীবত থেকে বিরত থাকার সবচেয়ে বড় ফজিলত হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যখন একজন মুসলিম গীবতকারীদের বলিষ্ঠভাবে বাধা দেয়, তখন সে আল্লাহ তাআলার নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশংসা পায়। এটি আল্লাহর কাছে উত্তম কাজ হিসেবে গণ্য হয়, যা তার জন্য আখিরাতে পুরস্কৃত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তোমরা এমনভাবে একে অপরকে সাহায্য করো, যাতে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারো।" (সূরা মায়িদা, ৫:২)

এই উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের গীবত রোধ করতে উৎসাহিত করেছেন।

৬. বিচ্ছিন্নতা এবং বিরোধ রোধ করা

গীবত কখনো কখনো মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কে দেয় এবং সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারে। যখন গীবতকারীরা একজন অপরের প্রতি ঘৃণা বা বিরাগ তৈরি করে, তখন তা সামাজিক বন্ধনকে দুর্বল করে দেয়। গীবত করার মাধ্যমে পরিবারের মধ্যে, বন্ধুদের **মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে** বিভেদ সৃষ্টি হয়। তবে যখন একজন মুসলিম গীবতকে বাধা দেয়, সে এই সব ধরনের বিভেদ থেকে সমাজকে রক্ষা করে। এর ফলে একটি সমাজ শান্তি ও ঐক্য বজায় রাখতে পারে

৭. মুসলিমদের একতা শক্তিশালী করা

যখন মুসলিমরা একে অপরকে গীবত করতে বাধা দেয়, তখন মুসলিম সমাজের মধ্যে ঐক্য দৃঢ় হয়। গীবত সমাজে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, কিন্তু তা রোধ করা সমাজের মধ্যে একতা এবং ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে। ইসলামে একতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এটি বিশ্বাসযোগ্য মুসলিম সমাজের মূল ভিত্তি।

গীবত একাধিক শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। গীবত কারীকে বাঁধা দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিমরা সমাজে শান্তি, সম্মান এবং ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় এবং একে অপরকে সৎ পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে, একজন মুসলিমের উচিত গীবত করার সময় অন্যদের বাধা দেওয়া এবং এভাবে নিজের পাপমুক্তি লাভ করা।

❀গীবতের গোনাহ মোচনের উপায়

গীবত এটি একটি গুরুতর পাপ, তবে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য ক্ষমার দ্বার খুলে রেখেছেন, এবং গীবতের গোনাহ মোচনেরও কিছু কার্যকরী উপায় রয়েছে।
নিম্নে গীবতের গোনাহ মোচনের উপায় সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা করা হলো:

১. তাওবা এবং ইস্তেগফার (ক্ষমা চাওয়া)
গীবত থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রথম এবং প্রধান উপায় হলো আল্লাহর কাছে তাওবা করা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,
"আর তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, হে মুমিনগণ, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।" (সূরা নূর, ২৪:৩১)
গীবত থেকে তাওবা করার জন্য প্রথমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ কাজ আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তাওবা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গোনাহ মাফ করে দেন, তবে যদি গীবতের শিকার ব্যক্তি জীবিত থাকে, তাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

২. গীবতের শিকার ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়া
যদি গীবত করা ব্যক্তি জীবিত থাকে এবং তার সম্মানহানি করা হয়, তাহলে তার কাছে সরাসরি ক্ষমা চাইতে হবে। একজন মুসলমানকে তার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে এবং সঠিক পথে ফিরে আসতে হবে।
রাসূল (সা.) বলেছেন,
“যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি গীবত করেছে, সে যদি তার কাছে ক্ষমা না চায়, তবে তার আমলগুলো সেই ব্যক্তির কাছে চলে যাবে।” (সহীহ মুসলিম)
এই পরিস্থিতিতে, গীবত করার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইলে তা আল্লাহর কাছে ভালো হিসেবে গণ্য হয়। তবে যদি সেই ব্যক্তি মারা গিয়ে থাকে, তখন তার জন্য দোয়া করা উচিত এবং আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চাইতে হবে।

৩. ভবিষ্যতে গীবত থেকে বাঁচার দৃঢ় সংকল্প করা

গীবতের গোনাহ মোচনের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো ভবিষ্যতে এটি না করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করা। একজন মুসলমান যখন তাওবা করে, তখন তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, সে আর কখনও গীবত করবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'লা বড় ক্ষমাশীল।" (সূরা ফুরকান, ২৫:৭০)

তাওবাহ'র পর শপথ করতে হবে যে, ভবিষ্যতে কখনো গীবত করা হবে না এবং সকল ধরণের মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. সৎ কাজের মাধ্যমে গীবতের ক্ষতিপূরণ করা

গীবত যদি কোনো ব্যক্তির সম্মানহানি করে, তবে তাকে সৎ কাজের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। যেমন, ওই ব্যক্তির জন্য দোয়া করা, তার কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং মানুষের সামনে তার ভালো দিকগুলো তুলে ধরা। যদি গীবতকারী ব্যক্তি অন্যের ব্যাপারে মন্দ কথা বলতো, তবে তার উল্টো গুণগান করা এবং ভালো দিকগুলো তুলে ধরা, এতে করে গীবতের ক্ষতি কিছুটা ক্ষতিপূরণ হতে পারে।

রাসূল (সা.) বলেছেন,

"তোমাদের একে অপরকে খোলামেলা ভাবে আল্লাহর পথে পরামর্শ দাও, যেন কেউ গীবত ও অন্যায়ের পথে না চলে।" (তিরমিজি)

৫. ইস্তেগফারের মধ্যে নিয়ত এবং দোয়া করা

গীবত করার পর পাপ মোচনের জন্য সাধারণ ইস্তেগফার (ক্ষমা চাওয়া) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানরা নিয়মিত ইস্তেগফার করতে পারে, কারণ আল্লাহ তাআলা অসীম দয়ালু এবং সব পাপ মাফ করার ক্ষমতা রাখেন। ইস্তেগফার এমন একটি তাওবা, যা কখনোই অকার্যকর হয় না। গীবত করার পর এই ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পুরোপুরি মাফ চাইতে হবে।

রাসূল (সা.) বলেন,

"যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে এবং শেষে ইস্তেগফার করে, আল্লাহ তার পাপগুলো মাফ করে দেন।" (সাহীহ আল-বুখারি)

৬. সতর্কতার সঙ্গে ভাষার ব্যবহার করা

গীবতের গোনাহ মোচনের একটি উপায় হলো ভবিষ্যতে গীবত বা অসৎ কথাবার্তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। একজন মুসলমান তার ভাষার প্রতি যত্নশীল হয়ে কথাবার্তা বলে, যাতে কোনো ব্যক্তি বা সমাজের সম্মানহানি না হয়।

রাসূল (সা.) বলেছেন,

"তোমরা ভালো কথা বলো এবং মন্দ কথা বলো না।" (সহীহ বুখারি)

এই সতর্কতার মাধ্যমে গীবত করার পরিণতির থেকে বাঁচা সম্ভব। সব সময় মনে রাখতে হবে, ইসলাম একটি নৈতিক ও সভ্য সমাজের কথা বলে, যেখানে ভাষার অপব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৭. নিজেকে সংশোধন করা এবং আত্মবিশ্লেষণ করা

গীবতকারী ব্যক্তি যদি তার অপরাধের প্রকৃত কারণ বুঝতে পারে, তবে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। গীবত এক ধরনের অন্তর্নিহিত অসন্তোষ, ঈর্ষা বা ক্ষোভ থেকে হয়। এই অনুভূতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যক্তিকে তার অন্তরের বিষাক্ত অনুভূতিগুলো পরিষ্কার করতে হবে। এজন্য ইসলামে ইবাদত ও দোয়া অত্যন্ত কার্যকর। গীবতের ক্ষতি মেটাতে হলে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে ভালো কাজের দিকে প্রবৃত্তি বাড়াতে হবে।

গীবত এর গোনাহ মোচনের জন্য আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য তাওবা ও ক্ষমার পথ উন্মুক্ত রেখেছেন। গীবতের গোনাহ মোচনের উপায় গুলো সম্পর্কে জানানো হয়েছে, যাতে মুসলমানরা এ পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে এবং আখিরাতে সফল হতে পারে। তাওবা করা, ক্ষমা চাওয়া, সৎ কাজ করা, ইস্তেগফার করা এবং ভাষার প্রতি সতর্ক থাকা— এই সব উপায় অনুসরণ করে গীবতের গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

❁ গীবতের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত ও প্রায়োগিক প্রক্রিয়া)

গীবত যেমন মারাত্মক এক পাপ, তেমনি এর থেকে মুক্তির পথও ইসলাম নির্ধারণ করেছে। একবার গীবত করে ফেললে শুধু মুখে 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বললেই দায় শেষ হয়ে যায় না, বরং শরীয়তসম্মতভাবে কাফফারা আদায় করাই একমাত্র মুক্তির উপায়। নিচে আমরা পর্যায়ক্রমে গীবতের কাফফারা সম্পর্কে আলোচনা করবো

১. গীবতের পাপ স্বীকার ও অনুতপ্ত হওয়া

প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হলো— আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তওবা করা এবং গীবতের জন্য অনুশোচনা বোধ সৃষ্টি করা।
আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন :
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
"হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।"
(সূরা যুমার: ৫৩)
গীবতের মতো মারাত্মক পাপের জন্য প্রথমেই মনে অনুশোচনা জন্মানো জরুরি। মানুষ নিজের ভুল স্বীকার করে ফেললেই তা সংশোধনের দ্বার খুলে যায়।

২. তওবা করা এবং গীবতের জন্য ইস্তিগফার করা
তওবা করার শর্ত তিনটি:
অপরাধ স্বীকার করা
ভবিষ্যতে তা আর না করার সংকল্প করা
তৎক্ষণাৎ কাজটি ত্যাগ করা
আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন :
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
"তোমরা সকলেই আল্লাহর দিকে তাওবা করো, হে মুমিনগণ, যাতে তোমরা সফল হও।"
(সূরা নূর: ৩১)

৩. যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া (যদি সম্ভব হয়)
তাওবা কেবল আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে শেষ হয় না। গীবতের একটি দিক হলো— এটি মানবাধিকারের লঙ্ঘন। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে যাঁর সম্পর্কে গীবত করা হয়েছে, তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া গীবতের পূর্ণ কাফফারার অংশ।
রাসূল (সা.) বলেন:
«مَن كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ...»
"কারও ভাইয়ের সম্মানের ক্ষতি করে থাকলে, আজই তার নিকট থেকে হালাল করে নিক।"
(সহীহ বুখারী: ২৪৪৯)

তবে এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়— যদি সরাসরি ক্ষমা চাওয়া পরিস্থিতি আরও খারাপ করে দেয়?

৪. যাদের কাছে গীবত করা হয়েছিল, তাদের সামনে প্রশংসা করা

যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট সরাসরি ক্ষমা চাওয়া সম্ভব না হয়, তবে যাদের সামনে গীবত করা হয়েছিল, তাদের নিকট ভুল স্বীকার করা ও সেই ব্যক্তির প্রশংসা করা শরীয়তসম্মত কাফফারা।

সালাফে সালেহীনদের থেকে বর্ণিত আছে— তারা গীবতের পর গোপনে সেই ব্যক্তির জন্য দোয়া করতেন ও সামনে তার প্রশংসা করতেন, যেন গীবতের পাপ কিছুটা মুছে যায়

৫. যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য দোয়া করা

গীবতের কাফফারা হিসেবে আল্লাহর কাছে দোয়া করা একটি কার্যকর ও পরিশুদ্ধ মাধ্যম। দোয়ার ভাষা এমন হতে পারে:

"হে আল্লাহ! আমি অমুক ব্যক্তির সম্পর্কে অন্যায়ের পথ অবলম্বন করেছি, তুমি তাকে ক্ষমা করো, তার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দাও।"

ابن سيرين (রহ.) বলেন:

"যার গীবত আমি করেছি, আমি তার জন্য বেশি বেশি ইস্তিগফার করতাম।"

৬. নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রতিজ্ঞা করা

তওবার পূর্ণতা তখনই আসে যখন নিজের জবান, চিন্তা ও বস্তুগত অবস্থা আল্লাহর নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য একজন মুমিনের উচিত প্রতিনিয়ত নিজেকে মুজাহাদা করা, যেন ভবিষ্যতে গীবতের মতো জঘন্য গুনাহে না জড়িয়ে পড়ে।

৭. নেক কাজ করে ক্ষতিপূরণ করা

গীবতের কাফফারায় কেবল মুখের অনুতাপ যথেষ্ট নয়। বেশি বেশি:

সালাত আদায়

নফল রোযা

সাদাকা

কুরআন তিলাওয়াত

গোপনে দান

এসব আমলের মাধ্যমে গীবতের ক্ষতিপূরণ হয়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন :

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات

"নেক কাজসমূহ মন্দ কাজগুলোকে দূর করে দেয়।"

(সূরা হূদ: ১১৪)

৮. সমাজে গীবতের বিরুদ্ধে কথা বলা

যে ব্যক্তি একবার গীবতের ভূল বুঝে ফেলে, তার উচিত সমাজকে সচেতন করা এবং গীবতের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা। এটি এক প্রকার কাফফারা, কারণ সে নিজের ভুল শুধরে অন্যদেরকে তা থেকে রক্ষা করছে।

গীবত করে ফেললে জীবন শেষ হয়ে যায় না; বরং আল্লাহর রহমত ও করুণা অপরিসীম। একান্ত আন্তরিক তওবা, মানুষের নিকট ক্ষমা, দোয়া ও নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলে একজন গীবতকারী আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে পারে।

۞গীবতকারী ক্ষমা চাইলে কি করা উচিত

রাসূল (সা:) গীবত সম্পর্কে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন এবং এটি থেকে বাঁচতে উৎসাহিত করেছেন। তবে, যখন কোনো ব্যক্তি গীবত করার পর ক্ষমা চায়, তখন মুসলিমের দায়িত্ব কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে।

১. ক্ষমা প্রার্থনাকে গ্রহণ করা

গীবতকারী যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চায়, তখন মুসলিমের উচিত তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। ইসলামে ক্ষমা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য ক্ষমার পথ খুলে দিয়েছেন এবং রাসূল (সা.) বারবার বলেছেন যে, মুসলিমদের উচিত একে অপরকে ক্ষমা করে দেওয়া।
রাসূল (সা.) বলেছেন,
"যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চায়, তার কাছে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন।"
(সহীহ মুসলিম)
এটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে, যদি কেউ সৎভাবে ক্ষমা চায়, তাহলে মুসলিমের উচিত তাকে ক্ষমা করা এবং তার উপর কোনো রকম প্রতিশোধ নেওয়া উচিত নয়।

২. গীবতকারীর তাওবা (শাস্তি এবং পুনঃপ্রচেষ্টা)

গীবতকারীর উচিত আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং নিশ্চিতভাবে নিজের ভুল থেকে ফিরে আসা। গীবত করার কারণে তার ওপর যে ক্ষতি হয়েছে, তা শুধরানোর চেষ্টা করা উচিত।

গীবতকারীর জন্য তাওবা করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ গীবত অন্য মানুষের সম্মান নষ্ট করার গুরুতর অপরাধ। তাওবা করলে আল্লাহ তার পাপ মাফ করেন।
রাসূল (সা.) বলেছেন,
"যে ব্যক্তি সৎভাবে তাওবা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।" (তাবারানি)

এছাড়া, গীবতকারী যদি তার পাপের জন্য দুঃখিত হয় এবং আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করে, তাহলে তার জন্য শান্তির পথ উন্মুক্ত হয়।
আল্লাহ তাআলা বলেন,
"আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী ও পবিত্রকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা বাকারাহ, ২:২২২)

৩. মৌখিক ক্ষমার পাশাপাশি দোয়া করা
গীবতকারীর ক্ষমা চাওয়ার পর মুসলিমের উচিত তাকে শুধু মৌখিকভাবে ক্ষমা করা নয়, বরং তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা। এই দোয়া হতে পারে তার জন্য শুদ্ধতা, ইস্তিকামা (সৎ পথে চলা) এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করার জন্য।
আল্লাহ তাআলা বলেন,
"তোমরা পরস্পর দোয়া করো, যাতে তোমরা একে অপরকে সহায়তা করতে পারো।" (সূরা আল-ইমরান, ৩:১৬৩)
গীবতকারীকে সহায়তা করার এক ভালো উপায় হলো, তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা যেন সে ভুল থেকে ফিরে আসে এবং তার পরবর্তী জীবনে সৎ পথে চলতে পারে।

৪. সমাজের শান্তি বজায় রাখা
গীবতকারীর ক্ষমা চাওয়ার পর, তাকে শাস্তি না দিয়ে, সমাজে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। গীবত কখনো কখনো সমাজে অশান্তি ও বিভাজন সৃষ্টি করে, কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার পর যদি মুছলিম সমাজের সদস্যরা একে অপরকে গ্রহণ করে, তখন সমাজে একতা বজায় থাকে। ইসলামে একতা ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
রাসূল (সা.) বলেছেন,
"মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার জন্য কোনো ক্ষতি করতে পারে না, না তাকে পরিত্যাগ করতে পারে।" (সহীহ মুসলিম)
তাহলে, গীবতকারীর ক্ষমা চাওয়ার পর তাকে পরিত্যাগ না করে, বরং তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং সমাজে একতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. গীবত থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেওয়া

যখন কেউ গীবত করার পর ক্ষমা চায়, তখন তাকে পরামর্শ দেওয়া জরুরি যাতে সে ভবিষ্যতে গীবত থেকে বিরত থাকে। ইসলামে মানুষের ভুল শোধরানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূল (সা.) বলেছেন,

"তোমরা একে অপরকে উপদেশ দাও, যাতে তোমরা সত্য পথে চলতে পারো।" (সূরা আল-আজাব, 33:16)

এটি নিশ্চিত করবে যে গীবতকারী ভবিষ্যতে একই ভুল পুনরাবৃত্তি না করে, আল্লাহর পথে চলবে।

৬. দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়ার মনোভাব

গীবতকারীর প্রতি দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়ার মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু তাদের যদি আবারও সংশোধন করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তারা তাদের ভুল শোধরাতে সক্ষম হতে পারে। ইসলামে প্রতিটি মানুষের জন্য তাওবা এবং ক্ষমার পথ খোলা থাকে।

রাসূল (সা.) বলেছেন,

"আল্লাহ সেই বান্দাকে ভালোবাসেন, যে তার পাপের জন্য অনুশোচনা করে এবং সৎ পথে ফিরে আসে।" (সহীহ বুখারি)

এটি বুঝায় যে, মুসলিমদের উচিত গীবতকারীকে তার ভুলের জন্য দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া এবং তাকে সৎ পথে পরিচালিত করা।

গীবতকারী যখন ক্ষমা চায়, তখন তার দোষকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার একটি সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে। মুসলিমদের উচিত তাকে ক্ষমা করা, তার জন্য দোয়া করা, সমাজে শান্তি বজায় রাখা, এবং তাকে ভবিষ্যতে গীবত থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেওয়া। ইসলামে ক্ষমা এবং তাওবা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং আমাদের উচিত আল্লাহর রাহে একে অপরকে সাহায্য করা, যাতে আমাদের সমাজে শান্তি এবং ঐক্য বজায় থাকে।

۞গীবত থেকে বাঁচার উপায়

গীবত আল্লাহর দরবারে চরম গুনাহ হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। ইসলামে গীবত করা হারাম, আর তা থেকে বাঁচার উপায়গুলো জানা এবং প্রয়োগ করাও ইমানদারদের অপরিহার্য কর্তব্য। নিচে ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ উপায় আলোচনা করা হলো যা একজন মুসলমানকে গীবত থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবে:

১. আল্লাহর ভয় অন্তরে ধারণ করা (تقوىٰ)
গীবত থেকে বাঁচতে হলে প্রথমত দরকার **তাকওয়া**, অর্থাৎ আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখা।

আল-কুরআন:
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
(সূরা নিসা: ১)
অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক।"
এই আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা যা বলছি, আল্লাহ তা দেখছেন ও শুনছেন।

২. নিজ জবানকে কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখা
গীবতের প্রধান মাধ্যম মুখের জবান।

হাদীসে এসেছে:
" من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة"
(বুখারী)

অর্থ: "যে ব্যক্তি তার জবান ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন।"
অতএব, জবান সংযত রাখাই গীবত থেকে বাঁচার প্রধান পথ।

৩. চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা
যেখানে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা হয়, সেখানে গীবতের আশঙ্কা বেশি।
রাসূল (সা.) বলেন:
"যে আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"
(বুখারী)

চুপ থাকার এই সুন্নাতি অভ্যাস গীবত থেকে দূরে রাখে।

৪. নফসকে পরিশুদ্ধ রাখা
গীবত অনেক সময় হিংসা, অহংকার, বা আত্মপ্রশংসার ফল। তাই অন্তরের রোগ দূর করাই মূল উপায়।

ইবন কাইয়্যিম (রহ.) বলেন: "যে ব্যক্তি নিজের নফসের চিকিৎসা করে না, সে অন্যের দোষে ব্যস্ত থাকে।"

৫. সময়কে কল্যাণে ব্যয় করা
ফাঁকা সময় মানুষকে গীবতের দিকে ঠেলে দেয়। এ সময় কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, ইলম চর্চা করলে গীবত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

আল-কুরআন:
" وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ"
(সূরা আসর)
সময় নষ্ট করলেই ক্ষতি—তাই সময়কে কাজে লাগাও।

৬. গীবতের গুণাহ সম্পর্কে চেতনা জাগানো
গীবতকারীদের শাস্তি নিয়ে কুরআন ও হাদীস পড়া ও মনে রাখা আত্মরক্ষা করে।

রাসূল (সা.) বলেন: "মিরাজে আমি এমন এক কওম দেখলাম যাদের নখ ছিল তামার তৈরি, তারা নিজেদের মুখ ও বুকে আঁচড় কাটছিল। বললাম, এরা কারা? বলা হলো, এরা গীবত করতো।"
(আবু দাউদ)

৭. গীবতের আসর এড়িয়ে চলা
যেখানে গীবত হচ্ছে, সেখান থেকে সরে যাওয়া অথবা প্রতিবাদ করাও আবশ্যক।

আল-কুরআন:
" وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَـٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ"

(সূরা আনআম: ৬৮)
গীবতের আসরে বসে থাকা গুনাহে সহযোগিতা।

৮. অপরের দোষ গোপন করার মানসিকতা গঠন
রাসূল (সা.) বলেন:

" من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة"
(মুসলিম)
অর্থ: "যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।"
এই হাদীস স্মরণে রাখলে গীবত করার মনোভাব কমে যাবে।

৯. আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়ে তোলা
যে ব্যক্তি নিজের ভুল খুঁজে বেড়ায়, সে অন্যের গীবত করার সুযোগ পায় না। তাই নিজেকে সংশোধন করাই উত্তম পন্থা।

১০. সদুপরামর্শ বা নসীহত ছাড়া অন্যের আলোচনা বন্ধ রাখা
কখনো গীবত ও নসীহতের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। তাই, যদি আলোচনার উদ্দেশ্য হয় উপকার ও সংশোধন, তাহলেই কেবল অনুমোদনযোগ্য।

১১. সঙ্গী নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা
সৎ সঙ্গীদের সাথে সময় কাটালে গীবত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। গীবতকারী সঙ্গী আপনাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

১২. ক্ষমা প্রার্থনার অভ্যাস করা
জানামতে বা অজানামতে গীবত হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, এবং যার গীবত করেছি তার কাছে ক্ষমা চাওয়া উত্তম।

১৩. গীবতের শিকার ব্যক্তির প্রশংসা করে ক্ষতিপূরণ করা
ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, "যার গীবত করা হয়েছে, তার প্রশংসা করে ও কল্যাণ কামনা করে সেই গুনাহ মোচনের চেষ্টা করা উচিত।"

১৪. গীবতের পরিণতির চিন্তা করা
যখনই গীবতের চিন্তা আসবে, তখনই কবর, মিজান ও হাশরের ময়দান স্মরণ করো। ভাবো, কিয়ামতে আমার নেক আমল অন্যকে দিয়ে দিতে হবে—তাহলে কি আমি এই পাপ করবো?

গীবত থেকে বাঁচার জন্য চাই দৃঢ় ইমান, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নফসের জিহাদ এবং আল্লাহর ভয়। এই পথ কঠিন হলেও মুমিনের কাছে তা সৌন্দর্যময়, কারণ এ পথেই রয়েছে জান্নাতের নিশ্চয়তা।

❁ গীবত ত্যাগের উপকারিতা

গীবত করা যেমন ভীষণ গুনাহের কাজ তেমনি তেমনি গীবত ত্যাগ করা মহান একটি ইবাদত। কুরআন-হাদীসের বহু স্থানে গীবত থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একজন মুমিন যখন গীবত থেকে বিরত থাকে, তখন তার চরিত্র হয় পবিত্র, অন্তর হয় প্রশান্ত, এবং সমাজে তার মর্যাদা বেড়ে যায়। নিচে গীবত ত্যাগের ১৪টি উপকারিতা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো।

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়
যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে, সে আল্লাহর আদেশ পালন করে।
কুরআন:
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
(সূরা হুজরাত: ১২)
অর্থ: "তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে।"
এই নির্দেশ পালনকারী ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হন।

২. জান্নাত লাভের আশাবাদী হওয়া যায়
রাসূল (সা.) বলেন:
"من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة"
(বুখারী)
অর্থ: "যে তার জবান ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন।"
জবান সংরক্ষণ মানেই গীবত ত্যাগ। অতএব, গীবত বর্জন জান্নাতের পথ।

৩. হৃদয়ে প্রশান্তি আসে

গীবত মানুষকে মানসিক অশান্তি, হিংসা ও জ্বালায় ভরিয়ে তোলে। আর গীবত ত্যাগকারী ব্যক্তি অন্তর থেকে শান্তি ও পরিতৃপ্তি অনুভব করে। সে কারো ক্ষতি না করে, তাই তার বিবেকও থাকে মুক্ত।

৪. আত্মশুদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

গীবত ত্যাগ করলে একজন ব্যক্তি নিজের আত্মাকে শুদ্ধ করতে পারেন, কারণ গীবত অন্তরের রোগকে বাড়িয়ে তোলে—যেমন অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ। এই রোগ থেকে বাঁচা আত্মশুদ্ধির অংশ।

৫. ইবাদতের স্বাদ ও বরকত বাড়ে

গীবত হৃদয়কে কলুষিত করে, ফলে ইবাদতে মন বসে না। গীবত বর্জনের ফলে ইবাদতে বরকত হয়, সালাত-তিলাওয়াত-দোআয় মনোযোগ আসে।

৬. সমাজে গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান বাড়ে

যে ব্যক্তি গীবত করে না, সমাজে তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে। মানুষ তাকে বিশ্বাস করে। সে হয় বিশ্বাসী ও দায়িত্ববান নাগরিকের প্রতিচ্ছবি।

৭. কেয়ামতে অন্যকে নেক আমল দিতে হয় না

রাসূল (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি গীবত করে, কেয়ামতের দিন তার নেক আমল সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে যার গীবত সে করেছে।"

(মিশকাত)

তাই গীবত ত্যাগ করলে নিজের আমলনামা রক্ষা পায়।

৮. জবান সংরক্ষণের অভ্যাস তৈরি হয়

গীবত ত্যাগ করলে মানুষ ধীরে ধীরে জবানকে হেফাজত করতে শেখে। এটি অন্যান্য গুনাহ থেকেও তাকে বাঁচিয়ে রাখে—যেমন মিথ্যা, ব্যঙ্গ ইত্যাদি।

৯. আল্লাহর রহমত নেমে আসে

রাসূল (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমের গায়েবে তার ইজ্জত রক্ষা করে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"

(আবু দাউদ)
অতএব, গীবত ত্যাগ করলে রহমতের ছায়া লাভ হয়।

১০. সমাজে ঐক্য ও ভালোবাসা তৈরি হয়

গীবত বিভেদ সৃষ্টি করে, আর গীবত না করলে হৃদ্যতা বাড়ে। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখতে গীবত ত্যাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১. দোআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে

হাদীসে আছে, গীবতকারী ব্যক্তি দোআর কবুল হতে বঞ্চিত হয়। অতএব, গীবত বর্জন দোআর দরজা খুলে দেয়।

১২. ফেরেশতারা দোআ করেন

ইবনে আবি দুনিয়া বর্ণনা করেন, "যে ব্যক্তি অন্যের গীবত থেকে নিজেকে রক্ষা করে, ফেরেশতারা তার জন্য দোআ করেন।"
এটি এক অনন্য সম্মান।

১৩. আত্মসম্মান ও স্থিতি অর্জিত হয়

নিজের জবান ও চরিত্র সংযত রাখা আত্মসম্মানের পরিচায়ক। মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে এবং তার পাশে থাকতে চায়।

১৪. মৃত্যুর পর মুক্তির সম্ভাবনা বাড়ে

যারা গীবতের অভ্যাস ছাড়ে, তাদের মৃত্যু হয় শান্তিময়। হাশরের ময়দানে তাদের পাপ কম হয়, এবং তারা মুক্তির সম্ভাবনায় এগিয়ে থাকে।

১৫.সময় ও শক্তির সঠিক ব্যবহার হয়:

গীবতকারীরা অধিকাংশ সময় অন্যের দোষ খোঁজার পেছনে নষ্ট করে। কিন্তু গীবত ত্যাগকারী ব্যক্তি সেই সময় আত্মউন্নয়নে ব্যয় করে। সে নিজের চরিত্র গঠনে মনোনিবেশ করে, যা ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে সহায়ক হয়।

১৬.দ্বীনের সৌন্দর্য রক্ষা পায়:

ইসলাম একটি শিষ্টাচারপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। গীবত তার সৌন্দর্য ধ্বংস করে। কিন্তু গীবত ত্যাগ করে একজন মুসলিম ইসলামের সৌন্দর্য রক্ষা করে এবং অন্যদের নিকট দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

১৭.দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান লাভ:

গীবত থেকে বিরত ব্যক্তি দুনিয়াতে সম্মানিত হয় এবং আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"আল্লাহ তাআলা মুমিনদের এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা উচ্চ করবেন।" (সূরা মুজাদালাহ: ১১)

গীবত থেকে নিজেকে বিরত রাখা এক কঠিন কাজ কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় কাজ। যে ব্যক্তি এই অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে, তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই আলোকিত হয়। শুধু মুখ নয়, বরং আত্মা পর্যন্ত হয় পবিত্র। তাই আসুন—আমরা গীবতের এই মরণব্যাধি থেকে মুক্ত থাকি, এবং এর ত্যাগের সুফল ভোগ করি।

۞ গীবত: উপসংহার ও সর্বশেষ পর্যালোচনা

গীবত ইসলামে একটি মারাত্মক পাপ এবং এর শাস্তি পার্থিব জীবন এবং আখিরাতে অত্যন্ত কঠিন। ইসলাম মানুষের মধ্যে শান্তি, ঐক্য এবং পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দিষ্ট আদর্শ প্রদান করেছে। গীবত এমন একটি পাপ, যা না শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির ঈমান এবং চরিত্রের ক্ষতি করে, বরং সমাজে বিভাজন এবং বিরোধ সৃষ্টি করে।

গীবত করার ফলে মানুষের অন্তর যেমন অশুদ্ধ হয়ে যায়, তেমনি সমাজে বিভক্তি এবং বিরোধও বাড়ে। ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং শান্তির প্রচার। কিন্তু গীবত এই সবকিছুর বিপরীত কাজ করে। কুরআন এবং হাদিসে গীবতের ব্যাপারে অনেক কঠোর সতর্কতা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা গীবত করার সঙ্গে সঙ্গে গীবত শোনাকে সম্পর্কিত শাস্তির ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন, কারণ দুটোই সমাজের শান্তি ও সুস্থিতির জন্য ক্ষতিকর।

এ ছাড়াও, গীবত শোনা শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং সেগুলো শোনার ফলে ব্যক্তি নিজের ঈমানিক মানসিকতাকেও দুর্বল করে তোলে। এই কারণে ইসলাম আমাদের গীবত শোনা থেকেও দূরে থাকতে উৎসাহিত করেছে এবং আমাদের নির্দেশনা দিয়েছে কিভাবে গীবত শোনার থেকে বাঁচা যায়।

গীবত শুধুমাত্র একটি ব্যক্তির পাপ নয়, এটি সমাজের ভারসাম্য এবং শান্তিকে দুর্বল করে তোলে। ইসলামি সমাজে গীবত প্রতিরোধ করতে হলে শুধুমাত্র ব্যক্তি নয়, সমগ্র মুসলিম সমাজকেই সচেতন হতে হবে এবং গীবত শোনার জন্য দৃঢ় মনোবল ও ঈমান থাকতে হবে। এর পাশাপাশি, গীবত করার পাশাপাশি, গীবত শোনারও শাস্তি রয়েছে এবং এটিকে পরিহার করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব।

ইসলামে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, এবং নিরাপত্তা তৈরির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গীবত মানুষের মনের মধ্যে সন্দেহ এবং বৈরিতা সৃষ্টি করে, যা ইসলামের মূল আদর্শের পরিপন্থী। ইসলাম শিখিয়েছে, যদি কেউ অন্যের গীবত শোনে, তবে তাকে সেটি বন্ধ করার এবং সঠিক পথ দেখানোর চেষ্টা করতে হবে। গীবত, তার শাস্তি এবং এর প্রতিকার শিখে, প্রত্যেক মুসলমানকে তার ঈমানী দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং একে অপরকে ইসলামিক আদর্শে শিক্ষা দিতে হবে।

সুতরাং, গীবত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সঠিকভাবে জানাতে হবে যে গীবত কি এবং কেন এটি ইসলামি সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। এবং একে পরিহার করে শান্তিপূর্ণ এবং সৎ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে হবে।